রাজারহাট

উপনগরীর অন্তরালে আর্ত মানুষের কান্না

এক সি পি আই (এম) কর্মীর জবানবন্দী

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন

উপনগরীর অন্তরালে
আর্ত মানুষের কান্না

এক সি পি আই (এম) কর্মীর জবানবন্দী

সি পি আই (এম-এল) লিবারেশন

রাজারহাট
উপনগরীর অন্তরালে
আর্ত মানুষের কান্না

এক সি পি আই (এম) কর্মীর জবানবন্দী

প্রথম সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ২০১০

প্রকাশনা ঃ সি পি আই (এম-এল) লিবারেশন
উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটি
দেশপ্রিয় নগর (৪ নং রেল গেট),
বেলঘড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৫৬
চলভাষ ঃ ৯৮৩৬৪৮৪৭৫২

মুদ্রনে ঃ
ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাঃ লিঃ
৩এ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মানিকতলা
কলকাতা-৫৪

মূল্য ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

রাজ্য রাজনীতি ও সমাজ-জীবন আজ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম, এস ই জেড, কৃষক গণহত্যা নিয়ে উত্তাল। কিন্তু আমাদের চোখের আড়ালে, বলা যায় চোখ বন্ধ থাকায়, উন্নয়নের সন্ত্রাস আরও আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাজারহাট-নিউ টাউন এই উন্নয়ন-সন্ত্রাসের চরম নিদর্শন। ঐ অঞ্চল থেকে একদল বামপন্থী কর্মী ও উচ্ছেদ হওয়া কৃষক তাদের জীবন-যন্ত্রণা জানাতে আমাদের কাছে এসেছিলেন। এই ছোট্ট পুস্তিকায় তাদের সেই বিস্তৃত ও মর্মস্পর্শী বিবরণীর অংশবিশেষ আমরা হাজির করার চেষ্টা করেছি। রাজারহাটের বামপন্থী কর্মীরা এ বিবরণীকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন এই আশায় আমাদের এই উপস্থাপনা।

এর সাথে আমরা রাজারহাট-নিউ টাউন, কুলপি-বারুইপুর প্রকল্প নিয়ে এক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তাভাবনা আপনাদের কাছে রাখলাম। উন্নয়নের নামে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে তা বুঝতে এই লেখা সহায়তা করবে।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ছোট এই পুস্তিকা প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়। রাজারহাটের সেই অকথিত কাহিনী রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মানুষ জানতে পেরেছেন। কিন্তু চাহিদা যে পরিমাণ তা মেটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে বেদিক ভিলেজ কাণ্ড রাজারহাট-নিউ টাউনকে আবার সংবাদ শিরোনামে নিয়ে আসে। 'উন্নয়নের' প্রশ্নে রাজ্যের শাসক দল ও প্রধান বিরোধী দলের মধ্যে যে 'ঐকমত্য' গড়ে উঠেছে, তার চরম প্রকাশ দেখা গেল বেদিক ভিলেজ কাণ্ডে। উন্নয়ন-সন্ত্রাসের সেই ঐকমত্যে রাজারহাট-ভাঙড় অঞ্চলের কৃষক ও গরিব মানুষ আজ দিশাহারা, সর্বস্বান্ত। এখন আবার শুরু হয়েছে নতুন 'তরজা'। কে কত কৃষক দরদী তা প্রমাণের তরজা। সবই ২০১১-এর নির্বাচনকে মাথায় নিয়ে। রাজ্যবাসী তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছেন।

পুনঃপ্রকাশের সময় আমরা প্রথম সংস্করণের ২/১টি তথ্য-প্রমাদ শুধরে নিয়েছি। এর সঙ্গে বেদিক ভিলেজ, অলিভ গার্ডেন সহ উপনগরীর অন্তরালে যে যৌন-পর্যটন শিল্প(?) রমরমিয়ে চলছে, যা বামফ্রন্ট সরকারের নয়া 'শিল্পোদ্যোগ' হিসাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, তার লজ্জাজনক ছবি পাঠকের কাছে আমরা রাখলাম।

পাঠকদের মতামত ও পরামর্শ আমাদের পাথেয়। আর রাজারহাট-ভাঙড়-নিউটাউনের জমিহারা কৃষকদের লড়াই একদিন জয়যুক্ত হবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। জনগণের চোখে উন্নয়নের প্রতারণা এবং প্রতারক দলগুলোর চরিত্র যত দ্রুত উন্মোচিত হবে ততই রাজ্যের মঙ্গল।

রাজারহাট-নিউটাউন

উপনগরীর অন্তরালে আর্ত মানুষের কান্না

উন্নয়নের রথের ঘোড়া ছুটছে। রেসের ঘোড়ার সর্বশেষ 'জাকপট' একলাখি 'ন্যানো'। সচ্ছল মধ্যবিত্তের ফ্যান্টাসি ছুটছে নগর, উপনগর থেকে মহানগরীর দিকে। সেই ছুটন্ত ন্যানোর ধাক্কায় কে পড়ে গেল, কে চাপা পড়ল, সেটুকু ভাবার সময় পর্যন্ত আমাদের হাতে নেই। চালক ভাবছে 'কানা রুইদাস'রা পথ চলতে না শেখার কারণে এভাবেই চাপা পড়ে। তার জন্য থমকে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করার 'মধ্যবিত্ত ন্যাকামো' করার মানে হয় না। যেমন কোনো অর্থ হয় না এই ন্যানোর এসেম্বলি প্ল্যান্টের জন্য সিঙ্গুর থেকে কত মানুষ উচ্ছেদ হয়ে গেল তার হিসাব রাখার। ফ্যান্টাসির এটাই ধর্ম। সব নিয়ে ভাবতে গেলে এক পা-ও চলা যাবে না, ঘরে বসে থাকতে হবে। আজকের এই প্রতিযোগিতার যুগে সেটা হাস্যকর চিন্তা। আবাসন তথা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গ্লোবাল ভিলেজে ছুটতে হবে। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যখন ডাইনোসরের মতো শেষ হয়ে গেছে, তখন নিজের গাড়ি ছাড়া তো পথ নেই। রাস্তায় শুধু প্রাইভেট গাড়ির লাইন। ন্যানো, মারুতি এস্টিম, 'ব্যাক ডেটেড' এ্যাম্বাসাডার, অলটো, বোলেরো—গাড়ি শুধু গাড়ি! কিন্তু ছুটবো কি করে? কলকাতা মহানগরীতে রাস্তা তো মাত্র ৬ শতাংশ। উড়ালপুল, ফ্লাইওভার এতসব করেও এক থেকে দেড় শতাংশ রাস্তা বেরুলো না। রাস্তা চওড়া করতে গিয়ে ফুটপাত সাফ। ফুটপাতে যে কটি গাছ ছিল, উড়ালপুল বানাতে গিয়ে সেগুলোকেও হটিয়ে দিয়েছে। এবার গাড়ির পোড়া পেট্রোল-ডিজেল থেকে যা বের হচ্ছে তাও শুষে নেওয়ার কেউ নেই। ট্রাফিক পুলিশ আর হকাররা কত কার্বন, সালফার পার্টিকেলস্ গিলবে! উন্নয়নের রথে চড়া মানুষগুলো গাড়ির কাঁচ তুলেও ঐ বিষাক্ত 'কার্সিনোজেন'-এর হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। চিন্তায় চিন্তায় দশে সাত এই হারে ডায়াবেটিস আক্রমণ করছে। উচ্চ রক্তচাপ শুধু শরীরকেই আক্রমণ করছে না, ঘরেও অশান্তি ডেকে আনছে। শিশুরাও এর হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। পরিবেশবিদরা যতই চেঁচাক, উন্নয়নের ঘোড়া থেকে নামার উপায় নেই। এ যেন বাঘের পিঠে চড়ে বসা। একবার উঠলে নামার উপায় নেই।

এদিকে কলকাতায় তো গাড়ি চালানো দায় হয়ে পড়েছে। বর্ষা আসলেই আতঙ্ক বাড়ে। গোটা কলকাতা জলের তলায়। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে কিছু ডাঙ্গা দেখা গেলেও গাড়ি ছুটবে কোন রাস্তা দিয়ে? মহানাগরিক থেকে পৌরপিতারা প্লাস্টিক-কে 'অপরাধী' বানিয়ে কিছুটা হাল্কা বোধ করতে পারেন। কিন্তু জল তো আর নড়ে না! বর্ষার জলে কলকাতায় ঢেউ খেলছে। আবাসনের তিন-চার তলায় বসে কাব্য চর্চা করা যেতে পারে, কিন্তু এক তলায় নামার কোনো উপায় নেই। আবাসনের এক তলার সব ঘরগুলো জলে থই থই। জল নিষ্কাশনের পাম্প-সেটগুলো জল ফেলবে কোথায়? কলকাতার জল নিকাশি সবগুলো খালই তো 'উন্নয়নের' স্বার্থে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজারহাটের নাওয়াই খাল (যা এককালে লাবণ্যপ্রভা নদী ছিল), বাগজোলা খাল, কেষ্টপুর-ভাঙড় কাটা খাল দিয়ে যে জল চলে যেত রাজারহাটের প্রাকৃতিক জলাভূমিতে, সেই ভূ-প্রাকৃতিক জলাভূমিকে উপনগরী গড়ার নামে ফ্ল্যাট তুলে তুলে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। কত মানুষ, কত উর্বরা চাষের জমি এর ফলে শেষ হয়ে গেছে তা ভাবার সময় না থাকলেও এবার তো ভাবতেই বাধ্য, বর্ষায় কলকাতার জল যাবে কোথায়? লবণ হ্রদে একটার পর একটা ভেড়ি (কাঁকড়ামারি ভেড়ি, বড় ভেড়ি, হাঁসার ভেড়ি, কাজার ভেড়ি, বাঘের ভেড়ি, কাঁসার ভেড়ি, নোড়তলা খাস ভেড়ি, দাসের ভেড়ি, বিদ্যাধরী স্পীল সমবায় ভেড়ি) বুঁজিয়ে বিদ্যাসাগর, লাবণী, বৈশাখী, দিগন্তিকা আবাসন, ময়ুখ ভবন, ঝিলমিল, স্টেডিয়াম, শিল্প এস্টেট গড়ে বিধান রায় যদি বাংলার 'রূপকার' হতে পারেন, তবে গৌতম-বুদ্ধ কেন বাংলার উন্নয়নের 'উন্নততর' রূপকার হতে পারবেন না? এই আধুনিক রূপকারদের উপনগরী গড়ার নেপথ্য গল্পটা তাই আপনাদের সামনে হাজির করার জন্য আমার ও সমমর্মী বন্ধুদের এই উপস্থাপনা। রাজারহাট-নিউ টাউন উপনগরীর ঝলমলে নিয়ন বাতির নীচে কত মানুষের আর্তনাদ শুনতে ও দেখতে পাওয়া যাবে তা এই জবানবন্দী থেকে ধারণা করতে পারবেন।

আমরা একসময় ঐ রূপকারদের দলের কর্মী ও সংগঠক ছিলাম। ছাত্রজীবন থেকে বাবা-মায়ের হাত ধরে লাল ঝাণ্ডার মিছিলে, সভা-সমিতিতে যেতাম। তারপর কোনো একদিন ঐ 'কমিউনিস্ট' দলের সদস্যও হয়ে গেলাম। জীবনের ৩০-৪০ বছর মানুষের কান্না-দুঃখ দূর করতে পথ হেঁটেছি, শ্লোগান তুলেছি। কিন্তু আজ ঐ দলের সাথে যুক্ত থেকে 'অপরাধী' হতে চাই না বলে সরে এসেছি। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার শরিক হতে আমরা নতুন করে পথ চলা শুরু করেছি। এবারও লাল ঝাণ্ডার তলায়। যে ঝাণ্ডা শহীদদের রক্তে ভিজে লাল হয়ে আছে। আপনারা যাঁরা এপথে হাঁটতে আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন, তাঁদের কাছেও এগিয়ে আসার আবেদন — পথে এবার নামো সাথী ... এই আশায় আমাদের ক্ষুদ্র উপস্থাপনা।

এক সি পি আই (এম) কর্মীর জবানবন্দী

রাজারহাটের মডেল কেন সিঙ্গুরে নেওয়া হল না! এই নিয়ে সি পি এমের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েছে। সিঙ্গুর যদি বুদ্ধ-নিরুপমের মডেল হয় তবে রাজারহাট-নিউটাউন জ্যোতি বসু-গৌতম দেবের 'ব্রেন-চাইল্ড'। নিউটাউন নাকি 'শান্তিপূর্ণ' উন্নয়ন তত্ত্বের গ্রহণযোগ্য মডেল। রাজ্যের আবাসনমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছেন যে, রাজারহাটে জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে আমাদের কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়নি। বিনা রক্তপাতে রাজারহাটের জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হয়েছে। ... যেখানে রাজারহাটের অধিকাংশ মানুষ জমি অধিগ্রহণের পূর্বে ছোট কৃষক বা পরের জমিতে শ্রম-বিক্রেতা কৃষক ছিলেন ও বংশ পরম্পরায় কৃষি কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য বিকল্প তাদের জানা ছিল না। শুধু জমি নয়, জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে শ্রেণী সংগ্রাম এবং আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজারহাটে এসব নাকি কিছুই হয়নি। তাই প্রকৃত সত্য প্রকাশ করতে এই লেখার অবতারণা।

রাজারহাটের জমি শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা ভারতে সবথেকে উর্বরা জমির মধ্যে একটি। কিছু বসত অঞ্চল বাদে অধিকাংশ জমি ছিল কৃষিযোগ্য, তিন থেকে চার ফসলি জমি। এই জমি পরিপুষ্ট হত কেষ্টপুর ও বাগজোলা খাল ও তৎসংলগ্ন ৩টি পাস খাল দ্বারা। সরকারি সেচ ব্যবস্থা ছাড়াই এই পাস খালের জল দিয়ে কৃষকরা তাদের জমিতে চাষের প্রয়োজনীয় জল পেতেন।

জমিকে উর্বরা করতে খুব বেশি সারেরও প্রয়োজন তাদের হত না। অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল ফলাতেন এখানকার কৃষকরা। ঐ সমস্ত জমিতে আউস, আমন, বিভিন্ন ধরনের রবি ও খরিফ শস্য উৎপাদন হত। এছাড়া মরশুমি সমস্ত ফসলের সাথে নানা ধরনের শাক-সব্জি, ফল ও ফুলের চাষ করা হত। এত পরিমাণে ফসল ও শাক-সব্জি এখানকার কৃষকরা তাদের জমিতে ফলাতেন যে, স্থানীয় অঞ্চলের চাহিদা মিটিয়েও তারা কলকাতা ও আশপাশের অঞ্চলের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ চাহিদা পূরণ করতেন। এছাড়াও বর্ষাকালে আশপাশের ভেড়ি ও খালবিল থেকে ঐ সমস্ত জমিতে ভেসে আসা সমস্ত রকমের জিওল মাছ স্থানীয় ও অন্যান্য এলাকার গরিব মানুষের মাছের চাহিদা মেটাত।

এখানকার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হিন্দু বা মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অল্প সংখ্যক মানুষ খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু সব ধর্মের মানুষ একত্রে সহাবস্থান করছে যুগযুগান্তর ধরে। পরস্পর পরস্পরের সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের কোথাও কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখানকার মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর কখনো কোনো আঘাত আসতে দেয়নি এবং এ বিষয়ে কোন গুজবকে কখনোই প্রশ্রয় দেয়নি।

এখানকার কৃষকরা কলকাতা বা সংলগ্ন শহরতলির মানুষকে শাক-সব্জি বা মাছের যোগানই শুধু দিত না, উপরন্তু খাঁটি, পুষ্টিকর ও অত্যন্ত উপাদেয় গোদুগ্ধ সরবরাহ করে শহরের মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এখানকার মানুষ তাদের গবাদি পশুদের পার্শ্বস্থ খাল পার করে ভেড়ী সংলগ্ন কচি সবুজ ঘাসভর্তি মাঠে ছেড়ে দিতেন এবং দিনের পর দিন প্রকৃতির দেওয়া অফুরন্ত খাদ্যে তারা হৃষ্টপুষ্ট হত। অর্থাৎ বিনা খরচেই তারা গবাধি পশু পালন করতেন। একমাত্র গাভিন হলেই তারা যার যার গরু বাড়ি নিয়ে যেতেন।

রাজারহাটের অধিগৃহীত অংশের মধ্যে মহিষগোঠ, থাকদাঁড়ী ও বর্তমানে সল্ট লেকের অন্তর্ভুক্ত মহিষবাথানের এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। বিশেষত স্বাধীনতার পূর্বে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের নেতৃত্বে আন্দোলন হয়েছিল। কারাবাস ও পুলিশের গুলিতে বহু কৃষকের প্রাণ হারানো এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে এখানকার কিছু জোতদার জমিদার সাথে থাকলেও শ্রেণীগতভাবে জোতদার জমিদারদের সাথে কৃষক বা ক্ষেতমজুররা কখনোই আপোষ করেনি। তাদের শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা তীব্র লড়াই আন্দোলন চালিয়ে গেছেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জমিদারি ও রাজন্য প্রথা উঠে গেলেও ভূমি ও ভূমি সংস্কার আইনকে কাজে লাগিয়ে ও তৎকালীন সরকারের ওপর নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে স্থানীয় জমিদার ও জোতদাররা কৃষকদের প্রচুর জমি নিজেদের নামে রেকর্ড করিয়ে নেয়। এছাড়াও নিরক্ষর, অশিক্ষিত কৃষকদের দারিদ্রতার সুযোগে বন্ধক রাখা প্রচুর জমি তারা হস্তগত করে।

অতীত ইতিহাস

বিধান রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে স্থানীয় জোতদাররা যা সুবিধা পেয়েছিল, তা সিদ্ধার্থ রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে অনেক বেড়ে যায়। পুলিশ ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের সাহায্য পেয়ে স্থানীয় গরিব মানুষের প্রচুর জমি তারা আত্মসাৎ করে। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভেড়ির মালিক ও জোতদার ছিল বিশ্বানন্দ নস্কর, জমির সরকার ও ভোলা সরকার, খগেন মণ্ডল, লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক এবং তার বংশধর অশ্বিনী প্রামাণিক ইত্যাদি। '৬৭ সালে যুক্তফ্রন্টের সময় থেকে কৃষক, ক্ষেতমজুর ও ভেড়ীর মজুররা লাল পতাকা তলে সংঘবদ্ধ হয়ে একদিকে জমি বাঁচানোর আন্দোলন, ক্ষেতমজুর ও ভেড়ি মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবি দাওয়াকে ভিত্তি করে আন্দোলন করতে থাকেন। ঐ সমস্ত ভেড়ির মধ্যে দু-একটি বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ভাঙ্গড়ে পড়ে, বাকি সবগুলো ছিল মহিষবাথান এলাকায় এবং তা একসময় অবিভক্ত রাজারহাটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ ভেড়িগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বড় পরেশ, ছোট পরেশ, বাথের ভেড়ি, দিল্লের ভেড়ি, সর্দার ভেড়ি, পত্রাবাদ ১, ২, ৩ নলবন, মুন্সীর ভেড়ি, চিন্তা সিং, নারকেলতলার ভেড়ি, মোল্লার ভেড়ি, বনঘেড়ী, ডাক্তার ভেড়ি ইত্যাদি। থাকদাঁড়ী, মহিষগোঠ, মহিষবাথান, কৃষ্ণপুর, নয়াপট্টি, পোলেনআইট, খাসমহল ইত্যাদি এলাকার প্রচুর মানুষ ঐ সমস্ত ভেড়িতে শ্রমদান করতেন। ভেড়ি শ্রমিকরা ভেড়ি মজদুর সংগঠন গঠন করে ভেড়ি মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন। যার প্রথম সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেন এই অঞ্চলের প্রভাবশালী বামপন্থী তথা সি পি এম নেতা রজনী মণ্ডল এবং এই লড়াইকে পরে আরও সংগঠিত ও আক্রমণাত্মক রূপ দেন দলেরই অপর প্রভাবশালী ও এলাকার অতি প্রিয় মানুষ দুলাল চৌধুরী। এইভাবে এক এক করে সমস্ত ভেড়িগুলোতে আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২ নং মহিষবাথান অঞ্চলে সি পি এম সমর্থিত কৃষক সংগঠন গঠিত হয়, যার প্রথম সম্পাদক সুধীর প্রামাণিকের সুদক্ষ নেতৃত্বে জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াই আরও তীব্রতা লাভ করে। ইতিমধ্যে ঐ সমস্ত এলাকায় গরিব ও খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে সি পি এম পার্টির যথেষ্ট প্রভাব পড়ার ফলে এই সংগঠন বাড়তে থাকে। ১৯৭৮-এর আগে যেখানে থাকদাঁড়ীতে মাত্র একজন পার্টি সদস্য ছিলেন, সেখানে ১৯৭৮ সালে থাকদাঁড়ী শাখায় ১ জন মহিলা সহ ৮ জন পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন।

ইতিমধ্যে এলাকার কৃষক সমিতি, ভেড়ি মজদুর সংঘ ও আপামর গরিব মানুষ সি পি এম পার্টির নেতৃত্বে এলাকার জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই আন্দোলন গড়ে তুলে তাদের দখলি বাড়তি জমি উদ্ধার করে গরিব ও ভূমিহীন মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন। এর মধ্যে মোল্লার ভেড়ি থেকে আনুমানিক ৫৫০ বিঘা জমি প্রায় ৫০০ জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এরপর চিন্তা সিং ও পত্রাবাদ ৩ নং ভেড়ি দখল করে ভূমিহীনদের দেওয়া হয়। প্রত্যেকেই কম পক্ষে দেড় থেকে দু'বিঘা করে জমি পান। এই লড়াইয়ে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল সি পি এমের রাজারহাট আঞ্চলিক কমিটির সাধারণ পার্টি সদস্য থেকে আঞ্চলিক কমিটির সদস্যতে উন্নীত হওয়া দুলাল চৌধুরীর। যিনি এলাকার গরিব ও খেটে খাওয়া মানুষের জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বক্ষণ তাদের পাশে থেকে, এলাকার বাসিন্দা না হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঘরের ছেলে হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জোতদার-জমিদারদের বিরুদ্ধে ঐ সমস্ত অঞ্চলের গরিব ও খেটে

খাওয়া মানুষের লড়াইকে কায়েমি স্বার্থপুষ্ট সি পি এমের আঞ্চলিক নেতৃত্ব সুনজরে দেখেনি। জোতদার-জমিদারদের সাথে আপোষকামী নেতৃত্ব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অছিলায় গরিব মানুষের এই সংগ্রামকে নষ্ট করতে উঠে পড়ে লাগে। ঐ লড়াইয়ে দুলাল চৌধুরী নেতৃত্ব দেওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক কমিটির দুই নেতা নিতাই রায় ও ভূপতি সেনগুপ্তকে ভেড়ি এলাকার দায়িত্ব দিয়ে পাঠনো হয়। তারা ভেড়ির মালিকদের কাছ থেকে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে, ভেড়ি শ্রমিকদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চাইলে অঞ্চ ল থেকে শ্রমিকদের দ্বারা বিতাড়িত হন।

রাজারহাট পাল্টে যাচ্ছে

দুলাল চৌধুরী সি পি এম পার্টি থেকে সরে যাওয়ার পর ১৯৮৮-৮৯-এর শেষদিকে অধিকাংশ ভেড়িগুলো সি পি এম পার্টি ও তার মদতপুষ্ট স্থানীয় মস্তান বাহিনীর হাতে চলে আসে। তারা ভেড়ি শ্রমিকদের ভেড়ির অংশীদারিত্বের লোভ দেখিয়ে, তাদের সাথে নিয়ে ভেড়ি মালিকদের উচ্ছেদ করে। এই ভেড়িগুলো হল—চিন্তা সিং-৭৫০ বিঘা, পত্রাবাদ-১৫০০ বিঘা, চকের ভেড়ি-১৭০ বিঘা, দিল্লের ভেড়ি;জমির পরিমাণ ১৫০ বিঘা (প্রায়), নারকেলডাঙ্গার ভেড়ি; জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬০০ বিঘা, মোল্লার ভেড়ি যার বর্তমান জমির পরিমাণ প্রায় ৭০০ বিঘা ও মুন্সীর ভেড়ির শ্রমিক খোল অংশ যার জমির পরিমাণ ২০০ বিঘা প্রায়। ভেড়ি শ্রমিকরা ভেড়ির অংশীদারিত্বের আশায় প্রত্যেকে ৩,০০০ টাকা করে দেন। শ্রমিকরা মালিকানা পেয়ে আগের থেকেও দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে মাছ চাষ করলেও, তারা সি পি এম পার্টি ও তার মদতপুষ্ট মস্তানদের দ্বারা বছরের পর বছর প্রতারিত হয়ে চলেছেন। এক পয়সাও তারা ঐ সমস্ত ভেড়ির মাছ চাষ থেকে লভ্যাংশ হিসাবে পান না। ঐ সমস্ত ভেড়ির বাৎসরিক আয় কয়েক কোটি টাকা, যার সবটাই সি পি এম আশ্রিত মস্তান, পার্টির ২৪ পরগণা জেলা ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের পকেটস্থ হয়। আর এদের ভয়ে ভীত ভেড়ি শ্রমিকরা মুখ বুজে বছরের পর বছর কাজ করে চলেছেন। আর এর মধ্যে যারা প্রতিবাদ করার সাহস দেখান, তাদের হয় মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয় নতুবা খুন করা হয়। এই ভাবে ঐ সমস্ত ভেড়িকে শ্রমিকদের দখলমুক্ত করে কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের দখলে নেওয়া হয়। এই সময় অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে কেষ্টপুর বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় গরিব মানুষের কাছ থেকে তোলা আদায় ও অত্যাচারের জন্য ত্রাস হয়ে ওঠা সি পি এমের রাজারহাট ১ নং আঞ্চলিক কমিটির সদস্য সমর দে (বাবু)-কে ঐ অঞ্চলের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় হাজার খানেক লোক সমবেত হয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে হত্যা করে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখের প্রয়োজন। যখন মালিক শ্রমিক বিরোধে এক একটি ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত ভেড়ি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে খাস জমিতে অবস্থিত শ্রমিকদের নিজ উদ্যোগে পরিচালিত ভেড়িগুলোতে মৎস্য উৎপাদন পূর্বের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হচ্ছে, ঠিক এমন সময় স্থানীয় সি পি এম নেতৃত্ব, মস্তান ও প্রশাসনের সহযোগে কমল গান্ধীর মতো জমি হাঙররা ভেড়ির জমিগুলোকে গ্রাস করতে উঠে পড়ে লাগল। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাভুক্ত বা খাস জমিভুক্ত কোন জমিকে রেয়াত করল না। এই প্রক্রিয়ায় পার্টি ও প্রশাসনের নীরবতা শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। নিজেদের হাড়ভাঙ্গা শ্রমের ফসল তারা অন্যের হাতে তুলে দেবে না। তাদের ক্ষোভকে পুঁজি করে জমি মাফিয়াদের সাথে দর কষাকষির উদ্দেশ্যে স্থানীয় সি পি এম নেতৃত্ব পরবর্তীকালে যে ভূমিকা পালন করল, তা একটি অত্যন্ত কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসাবে লিপিবদ্ধ থাকবে। তারা তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ভেড়ি আন্দোলনের শ্রমিক সমিতির নেতৃত্ব পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এই উদ্দেশ্যে ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ রাজারহাট ১ নং লোকাল কমিটির তৎকালীন সম্পাদক ভূপতি সেনগুপ্ত, মহিষবাথান অঞ্চলের পার্টি নেতা, যিনি ভেড়ি মজদুর সমিতির নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন, তাকে একটি চিঠি দিয়ে উক্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে চন্দ্র পাত্র (কৃষক ও ভেড়ি মজদুর সমিতির নেতা কমল পাত্রের ভাই)-কে ঐ দায়িত্বে বহালের নির্দেশ দেন। যার উদ্দেশ্য ছিল চন্দ্র পাত্রের শ্রমিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে প্রশমিত করে নিজেদের অভিষ্ট উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করা। কিন্তু পরিহাসের বিষয় চন্দ্রের উক্ত দায়িত্ব প্রাপ্তির ঠিক পরের দিনই সি পি এম মদতপুষ্ট কুখ্যাত সমাজবিরোধী গৌর মণ্ডল, লুইস মণ্ডল ও ক্ষিতীশরা আশুর ভেড়ি (যেখানে এ্যাকোয়াটিকা পার্ক গড়ে উঠেছে) দখলে নিয়ে তার বাঁধ কেটে দেয়। উল্লেখ্য আশুর ভেড়ি, চকের ভেড়ি ও আরও কয়েকটি ভেড়ি সম্পূর্ণভাবে ভেড়ি শ্রমিকরাই চালাতেন। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত ভেড়ি শ্রমিকরা চন্দ্রের নেতৃত্বে সেখানে গেলে, ঐ সমস্ত কুখ্যাত সমাজবিরোধীরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ঐ দিকে যেতে নিষেধ করে ও একটি গাছকে সীমানা নির্ধারিত করে হুমকি দেয় যে, তা অতিক্রম করলেই তাদের বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হবে। এই ঘটনাটি স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার ও পুলিশ কর্মীদের সম্মুখে ঘটে। এই ঘটনার প্রতিবাদে যখন জানতে চাওয়া হয় যে তাদের উপস্থিতিতে কিভাবে ঐ ধরনের বেআইনি কাজ সংগঠিত হয়, তার জবাবে উক্ত পুলিশ কর্মীরা চন্দ্রকে পাল্টা হুমকি দিয়ে বলেন যে, তাকে ও তার দাদাকে শ্রমিক ক্ষ্যাপানোর রাজনীতি থেকে সরে আসতে হবে। নতুবা তাদের ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু এই ঘটনায় ভীত না হয়ে শ্রমিকরা এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে পার্টি ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলল। তাদের আন্দোলনে শঙ্কিত পার্টি নেতৃত্ব শ্রমিকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে প্রশমিত করার নানা চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে রাজারহাট ১ নং আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ভূপতি সেনগুপ্তের লেখা ৩০ জানুয়ারী ১৯৯১ চিঠি মারফৎ আন্দোলনকারী শ্রমিক নেতৃত্বের মধ্যে মোহিত বিশ্বাস, হীরেন মণ্ডল ও বিমল পাত্র (চন্দ্র)-কে ৩ ফেব্রুয়ারী দুপুর ২টোর সময় ঐ আঞ্চলিক কমিটির অফিসে পার্টির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক অমিতাভ বসুর উপস্থিতিতে ভেড়ি সংক্রান্ত সমস্যার আলোচনায় অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত সভায় শ্রমিক নেতৃত্বকে তিরষ্কার করে, তাদের আন্দোলন থেকে সরে আসার নির্দেশ দিলে, শ্রমিকরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে আরও বড় ধরনের লড়াই আন্দোলনের অঙ্গীকার করেন। স্থানীয় সমাজবিরোধী, জমি মাফিয়া, পার্টি ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে স্তব্ধ করে দিয়ে এক অভূতপূর্ব লড়াইয়ের স্বাক্ষর রাখলেন ভেড়ি শ্রমিকরা। শ্রমিকদের আন্দোলনের জেরে ভীত হয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ অপর একটি চিঠি মারফৎ চন্দ্র পাত্র ও মহিষবাথান ২ নং পঞ্চায়েত অন্তর্গত সমস্ত পার্টি সদস্য, ভেড়ি শ্রমিক ও সমস্ত শাখা সম্পাদককে জেলা সম্পাদক অমিতাভ বসুর উপস্থিতিতে ভেড়ি সংক্রান্ত একটি জরুরী বিষয় আলোচনার জন্য লোকাল কমিটি অফিসে উপস্থিত থাকার জন্য রাজারহাট ১ নং আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ভূপতি সেনগুপ্ত পুনরায় অনুরোধ করেন। বলাবাহুল্য উক্ত আলোচনায় কোন রফাসূত্র বেরিয়ে আসেনি। ইতিমধ্যে চকের ভেড়ি সহ আরও কয়েকটি ভেড়িতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে ১৯৯৩ সালে কোন এক তারিখে কমল পাত্র, চন্দ্র

পাত্র সহ নেতৃত্বকারী ভেড়ি শ্রমিকদের কয়েকজনকে কলকাতার শিয়ালদহে অবস্থিত পূর্বতন সি পি এম পার্টির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা অফিসে ডেকে তৎকালীন জেলা সম্পাদক সমীর পুততুণ্ডু ও অন্যান্য জেলা পার্টি নেতৃত্ব ও হিডকোর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী গৌর মণ্ডল, লুইস মণ্ডলদের দ্বারা প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। এরপর একে একে বিদ্রোহী নেতা কর্মীকে খুন করে এলাকা থেকে বিতাড়িত করে ভেড়িগুলোর দখল নিয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে জঘন্য ও কদর্যভাবে শ্রমজীবী মানুষের একটি আন্দোলনকে একটি 'বাম'দল অচিরেই শেষ করে দিল। যা বাম আন্দোলনের ক্ষেত্রে কলঙ্কিত অধ্যায় হিসাবে লিখিত থাকবে।

জমির লুট কাহিনী ও সন্ত্রাসের বীভৎসতা

রাজারহাট উপনগরী গড়ার প্রয়োজনে প্রাথমিকভাবে একুশটি মৌজার জমি অধিগ্রহণের জন্য ব্রিটিশ উপনিবেশ আইনকে (১৮৯৪) কাজে লাগিয়ে ১৯৯৫ সালে রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তর নোটিশ জারি করে (নং ২৭৮৭ এল এ (২) ৪ এইচ ১১/৯৪ হাউসিং ও রাজ্যপালের আদেশক্রমে উপসচিব পশ্চিমবঙ্গ সরকার আই সি এ ৩৪২৪ (২)৯) এবং উক্ত একুশটি মৌজার সমস্ত কৃষি ও জলা জমি অধিগ্রহণ করে। ২১টি অধিগৃহীত মৌজাগুলো যথাক্রমে ১-তারুলিয়া জে এল নং ২১, ২-গোপালপুর জে এল নং ২, ৩-সলুয়া জে এল নং ৩, ৪-চণ্ডিবেড়িয়া জে এল নং ১৫, ৫-হাতিয়াড়া জে এল নং ১৪, ৬-আটঘড়া জে এল নং ১০, ৭-কৈখালী জে এল নং ৫, ৮-তেঘড়িয়া জে এল নং ৯, ৯-নপাড়া জে এল নং ১১, ১০-দশদ্রোণ জে এল নং ৪, ১১-রাইগাছি জে এল নং ১২, ১২-মহিষগোট জে এল নং ২০, ১৩-সুলংগুড়ি জে এল নং ২২, ১৪-মহিষবাথান জে এল নং ১৮, ১৫-রেকজোয়ানী জে এল নং ১৩, ১৬-ঘুণী জে এল নং ২৩, ১৭-বালিগড়ী জে এল নং ৩৪, ১৮-থাকদাঁড়ী জে এল নং ১৯, ১৯-চক পাঁচুলিয়া জে এল নং ৩৩, ২০-যাত্রাগাছি জে এল নং ২৪, ২১-কদমপুকুর জে এল নং ২৫। পরে আরও কিছু মৌজা অধিগৃহীত হয়, যথা কালিকাপুর, পাথরঘাটা, মহম্মদপুর, নতুন পুকুর, চাবনা ও হুদারআইট। ২১টি মৌজার মোট ৭,০০০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের আওতায় আসে এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৯৯ সালে ১-এর ১২(২) ধারা অনুযায়ী। এর আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২,৫০,০০০।

ভূমিরাজস্ব দপ্তরের নথি মোতাবেক রেকর্ডকৃত জমির মালিক ছিলেন ৩০,০০০-এর অধিক। নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ছিল ৫,০০০ ও অনথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ছিল তার দ্বিগুণ। রাজারহাটের জমি অধিগ্রহণের নোটিফিকেশন ও অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার অনেক আগে থেকেই জমি মাফিয়ারা রাজারহাটের বর্তমানে অধিগৃহীত জমি গরিব কৃষকদের কাছ থেকে নেওয়ার জন্য সক্রিয় হয়। ১৯৮৪-৮৫ সাল নাগাদ রাজ্যের সব থেকে বড় জমির দালাল কমল গান্ধী ও তার আত্মীয় ও বন্ধুরা বিঘার পর বিঘা জমি তৎকালীন বাজার মূল্য থেকে বেশি দর দিয়ে অর্থাৎ যেখানে সেই সময় বিঘা প্রতি জমির দাম ছিল ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা, সেখানে তারা ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা দরে কৃষিজমি কিনে নেয়। কমল গান্ধী এইভাবে রাজারহাটের একটি বড় অংশের জমির নামে-বেনামে মালিক হয়ে যায়। এর মধ্যে কমল গান্ধীর আত্মীয়া সি পি এমের রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্যা সরলা মাহেশ্বরীর দখলেও বেশ কিছু জমি চলে আসে। সি পি এম এবং তাদের পরিচালিত সরকার ও প্রশাসনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ায় কমল গান্ধী ১৯৮৪ সালে সরকারের রাজারহাটের উপনগরী সংক্রান্ত পরিকল্পনার নকশা ও যাবতীয় নথি অফিস থেকে সহজেই পেয়ে যায়। যার পরই তিনি রাজারহাটে জমি কিনতে শুরু করেন। জমি কেনাবেচার কাজ বেশ কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে এবং এই কাজে তিনি সি পি এম রাজ্য নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট জেলা, জোনাল ও আঞ্চলিক নেতৃত্ব, স্থানীয় পঞ্চায়েত, সি পি এম আশ্রিত সমাজবিরোধী ও পুলিশের সাহায্য পেয়েছেন।

কমল গান্ধীর পোষা গুণ্ডারা জমি বিক্রিতে অনিচ্ছুক থাকদাঁড়ী ও মহিষগোঠের মানুষদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত করে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করল। কিছু কিছু খুনও এই সময় সংঘটিত হয়। কমল গান্ধী সি পি এম এবং তার মদতপুষ্ট মস্তানদের সাহায্যে গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে জমি কিনে জমি দিতে অনিচ্ছুক কৃষকদের জমিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল, তাদের যাতায়াতের পথ এমনভাবে আটকাতে লাগল যাতে কৃষকরা তাদের অতি সাধের জমি তার হাতে তুলে দেন।

রাজারহাটের জমি অধিগ্রহণ বিষয়ক নোটিফিকেশনের দু'বছর আগে ১৯৯৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিষবাথান ২ নং থাকদাঁড়ী অঞ্চলে এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী রুইদাস মণ্ডল ওরফে রুহিস ওরফে লুইস-কে সি পি এম ১৩৯ বুথে প্রার্থী করে। এর পেছনে যে কায়েমী স্বার্থ লুকিয়ে ছিল, তা হচ্ছে এই যে, রুহিস ওরফে লুইস, যে এক সময় কংগ্রেস আশ্রিত গুণ্ডা ছিল, সে ইতিমধ্যে মহিষবাথান, মহিষগোঠ সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় খুন, ডাকাতি সহ সমস্ত ধরনের সমাজবিরোধী কাজের মাধ্যমে এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হলে, ঐ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে রাজারহাট উপনগরীর জন্য জমি অধিগ্রহণ করা সহজ হবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লুইসকে জেতাতে মরিয়া সি পি এমের রাজারহাটের পার্টি নেতৃত্ব ঐ এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নির্বাচনী সমস্ত বিধিনিষেধকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে গণনায় ২ ভোটে হেরে যাওয়া প্রার্থীকে ১ ভোটে জিতিয়ে আনল।

লুইস পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার পর থেকেই ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবনে ঘন কালো দিন ঘনিয়ে আসল। কায়েম হল খুন, সন্ত্রাসের রাজত্ব। সি পি এম পার্টি নেতৃত্ব ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে স্থানীয় গরিব কৃষিজীবি মানুষের কাছ থেকে জোর করে জমি দখল শুরু হল। প্রাণের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষদের কাছ থেকে বন্দুক ও পিস্তলের নলের ডগায় দলিলে সই করিয়ে, বিঘার পর বিঘা জমি নিজেদের ও স্থানীয় সি পি এম পার্টি নেতৃত্বের পছন্দ-সই ব্যক্তিদের দখলে নিয়ে আসল। এছাড়াও নথিভুক্ত বহু বর্গাদারের নাম বাদ দিয়ে নিজেদের পছন্দমতো ব্যক্তিদের নামে তারা বর্গা রেকর্ড করাতে লাগল। এই কাজে তারা রাজনৈতিক সাহায্য ছাড়াও স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের সাহায্য সহযোগীতা পায়।

সি পি এম এবং তার মস্তান বাহিনীর এইরকম অন্যায়ভাবে জমি দখল প্রক্রিয়া চলতে থাকায় ঐ অঞ্চলে সন্ত্রাসের গহন অন্ধকার নেমে আসে। এক এক করে পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকার সমাজবিরোধীরাও তাদের সাথে একই ছাতার নীচে চলে আসে। কেষ্টপুরের কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের ডেরা শিবকালী মন্দির অঞ্চলের সমাজবিরোধীরা তাদের সাথে হাত মিলিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে জমি লুঠ করতে শুরু করল। এছাড়াও জড়ো করা হতে লাগল হাওড়া, আসানসোল, উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ বিভিন্ন জেলার ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীকে। ভয় দেখিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে স্থানীয় মস্তান সহ সি পি এম-এর স্থানীয় বিভিন্ন নেতাদের নামে জমির

পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (আম মোক্তার নামা) লিখিয়ে নেওয়া হল।

যে সমস্ত মানুষ সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে জমি ছাড়তে অনিচ্ছুক, তাদের ওপর নামিয়ে আনা হল অবর্ণনীয় অত্যাচার। মারধর ও অত্যাচারের ভয়ে অনেকেই এলাকা ছাড়তে লাগলেন। আর যারা সাহস করে পুলিশকে জানাত তারা নৃশংসভাব খুন হতে লাগল। যে সমস্ত মানুষ এলাকা ছেড়ে যেতে লাগলেন, তাদের বাড়ি ভেঙ্গে জমিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে মাটি সরিয়ে ফেলা হতে লাগল। যাতে ফিরে এসে আর তারা সেই সমস্ত জমিতে বসবাস না করতে পারে। এমনকি পারিবারিক/শরিকি বিবাদের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক জমি এরা দখল করে নেয়। এক্ষেত্রে তারা পার্টির সদস্য বা সমর্থকদের পর্যন্ত দয়া করেনি।

শুরু থেকেই এলাকার সমস্ত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে সি পি এম-এর যে সমস্ত সদস্য সমর্থক ও নেতৃত্ব এতদিন পর্যন্ত এলাকার গরিব খেটে খাওয়া, শোষিত নিপীড়িত মানুষের লড়াইয়ে সাথে থেকেছেন তাদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ সংগঠিত করে, তাদের মধ্যে কয়েক জনকে হত্যা করে বাকিদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করে। এইভাবে একজন মাত্র পার্টি সদস্য করিম বক্স মোল্লা বাদে সি পি এমের থাকদাঁড়ী শাখাটির সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্তি ঘটে। এর সাথে সাথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সমস্ত গণসংগঠনগুলো। শুধু ঐ এলাকাই নয়, সমগ্র রাজারহাট জুড়ে পরিকল্পিতভাবে সমস্ত পার্টি শাখা ও গণসংগঠনগুলো থেকে নীতি ও আদর্শবান কমরেডদের বিতাড়িত করে তাদের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ ঘটানোর জন্য রাজারহাটের নেতৃত্ব ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু করল। ঐ সমস্ত সংগঠন মায় অধিকাংশ ক্লাব সংগঠনগুলো ঐ সময় থেকেই কার্যত অসামাজিক শক্তির দখলে চলে যেতে থাকে।

কিছু কিছু মানুষ যারা প্রতিবাদ করার সাহস দেখান, তাদের মধ্যে অনেককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোপনে হলেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশ্য দিবালোকে তা সংগঠিত হয়।

রাজারহাটের জমি অধিগ্রহণের সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে, খুন খারাপির সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। এইভাবে অধিগ্রহণের আগে ও পরে সব মিলিয়ে ৫০-এর অধিক কৃষিজীবি মানুষ শুধুমাত্র মহিষগোঠ ও থাকদাঁড়ী অঞ্চলে নিহত হন। আস্তে আস্তে সন্ত্রাসের জাল বিস্তার করে সি পি এমের গুণ্ডাবাহিনী সমগ্র রাজারহাটের দখল নিয়ে নেয়।

অধিগ্রহণ ও কৃষকের প্রতিবাদ আন্দোলন

১৯৯৯ সালের এপ্রিল-মে মাস থেকে সরকারীভাবে রাজারহাটের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। জমির মালিক সহ বর্গাদারদের কাছে নোটিশ যায়। অধিগ্রহণের শুরুতে মহিষগোঠ ও থাকদাঁড়ীর কৃষকরা সকলেই নোটিশ নিতে অস্বীকার করেন। প্রথমত, জমির কাঠাপ্রতি যে ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকা, তা সরকার দ্বারা নিবন্ধকরণ (রেজিষ্ট্রেশন)-এর তৎকালীন মূল্য থেকে অনেক কম। সেই সময় সরকার নির্ধারিত নিবন্ধকরণের বাজারদর ছিল ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা প্রতি কাঠা। দ্বিতীয়ত, কৃষি ছিল এখানকার মানুষের একমাত্র পেশা, যা দিয়ে অনায়াসে পরিবারের ভরণ-পোষণ চলত। কারণ আগেই বলেছি যে, ঐ সমস্ত এলাকার কৃষি জমি ছিল অত্যন্ত উর্বরা।

নোটিশ নিতে অসম্মত কৃষকদের ওপর প্রচণ্ড দমন-পীড়ন শুরু হল। সি পি এমের গুণ্ডাবাহিনী কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ভীতি প্রদর্শন করে তাদের নোটিশ নিতে বাধ্য করলে, সমগ্র রাজারহাট জুড়ে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কৃষিরক্ষা কমিটি গঠন করে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাদের ঐ সংগঠনের নাম দেওয়া হল রাজারহাট কৃষি রক্ষা কমিটি। এই সংগঠন কোন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। যদিও এই সংগঠনের তরফ থেকে তাদের প্রতিনিধিরা বিচ্ছিন্নভাবে দু-এক বার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে যোগাযোগ করে এই বিষয়ে তাদের নিস্পৃহতার কথা জানতে চাইলে, তৃণমূল নেত্রীর কাছ থেকে জবাব আসে যে, কৃষকরা একমাত্র তাদের দলের ছত্রছায়ায় এলে তবেই তার দল কৃষকদের সাথে লড়াইয়ে যোগ দেবে। যা রাজারহাটের কৃষকরা মেনে নেননি। ফলে 'একলা চলো রে' নীতি নিয়ে তারা লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। কংগ্রেস বা মমতা ব্যানার্জীর দলের পক্ষে কখনোই যে জমি-গ্রাসের বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব ছিল না তা তাদের দলের পরবর্তী ভূমিকা থেকে পরিষ্কার হয়। যাদের নেতা কর্মীরা ক্রমশই এই প্রক্রিয়ায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে শুরু করে।

এই সময় আরও একটি সংগঠন থাকদাঁড়ী ও মহিষগোটে গড়ে ওঠে যার নাম মহিষবাথান জীবিকাচ্যুত বেকার সমিতি, যাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫০-রও অধিক।

এই দুই সংগঠনের লড়াইয়ে হতচকিত সি পি এম এবং তার গুণ্ডাবাহিনী কিছুটা পশ্চাদপসরণ করে। ইতিমধ্যে এলাকার জনগণের একটি বড় অংশের মধ্যে এই বিষয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে, সি পি এম পার্টির রাজারহাট জোনাল কমিটির এক সভায় থাকদাঁড়ী ও মহিষগোঠ অঞ্চলে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, রাজারহাটে আর কোনও জমি অধিগ্রহণ করা হলে তাতে বাধা দেওয়া হবে। মনে করার কোনো কারণ নেই যে, উক্ত নেতৃত্ব বুঝি হঠাৎ করে কৃষক দরদী হয়ে উঠেছে। এটা ছিল আসলে হঠাৎ আসা প্রত্যাঘাত সামলানোর জন্য সময় নেওয়া। তাছাড়া কিছু সময়ের তাদের প্রয়োজন ছিল পরবর্তী পরিকল্পনার রূপরেখা নির্ধারণ করার জন্য। এরপরই জমি অধিগ্রহণের সমর্থনে পুনরায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সি পি এমের পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষকদের নানাভাবে প্রলোভন দেখানো হয়। তাদের রাজারহাট উপনগরীতে তুলনামূলকভাবে সস্তায় জমির প্লট ও দোকান পাওয়ার অগ্রাধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এছাড়াও মেগাসিটি প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে যুক্ত করার নানারকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কৃষকদের আন্দোলনের পথ থেকে টলাতে পারল না। এমনকি নগরায়ন দপ্তরের মন্ত্রী এবং সি পি এমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌতম দেব ও রাজারহাটের বিধায়ক রবিন মণ্ডল সহ সি পি এমের একাধিক জেলা ও রাজ্য কমিটির নেতা রাজারহাটের অধিগৃহীত বিস্তৃত অঞ্চ ল জুড়ে একাধিকবার সভা করেও কৃষকদের মন জয় করতে ব্যর্থ হন।

ইতিমধ্যে সি পি এম নেতৃত্ব তাদের পরিকল্পনাকে রূপদান করতে Neighbourhood Committee গঠন করে। রাজারহাটের বিধায়ক রবিন মণ্ডলকে তার চেয়ারম্যান নিয়োগ করে ধীর গতিতে চলা জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গতি প্রদান করতে আরও জঘন্য ও ভয়ঙ্কর খেলা শুরু করা হল। লোক মারফৎ বা পুলিশ পাঠিয়ে উক্ত দুই কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বকারী ব্যক্তিদের রবিন মণ্ডল বা গৌতম দেবের সাথে দেখা করতে বলা হয়। এমনকি উক্ত নেতাদের সাথে বৈঠকে তৎকালীন রাজারহাট থানার ওসি-ও থাকতেন। কখনো সখনো ঐ সমস্ত সভায় কুখ্যাত সমাজবিরোধীরাও থাকত। সেখানে তাদের প্রলোভন থেকে শুরু করে ভয়ভীতিও দেখানো হত।

এতেও যখন কোন কাজ হল না তখন সি পি এম নেতৃত্ব অধিগৃহীত এলাকা সংলগ্ন অঞ্চলের যুবকদের জড়ো করে অধিগ্রহণের প্রয়োজনয়ীতা সহ সমগ্র রাজারহাটের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য বোঝাতে লাগলেন। এমনকি গৌতম দেব কেষ্টপুরে রবীন্দ্রপল্লীর নীলকণ্ঠ ভবনে এরকমই

একটি পার্টি কর্মী ও যুব সমাবেশে উক্ত অধিগ্রহণের পক্ষে বক্তব্য রেখে বোঝালেন যে, "এই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে পাশের এলাকাগুলো উন্নত হবে। বিপুল সংখ্যক বেকারের কথা মাথায় রেখেই আমরা তাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তনে দায়বদ্ধ। এই অঞ্চলে উপনগরী গড়ার ক্ষেত্রে যে বিপুল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার সাথে যুক্ত হয়ে এখানকার যুবকরা অন্তত মাসে ৫০০০ থেকে ৬০০০ টাকা করে ন্যূনতম আয় করতে পারবে এবং তা দীর্ঘমেয়াদী হবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া একটু মন্থর গতিতে চলছে তার কারণ এই অঞ্চলের কৃষকরা জমি দিতে অনিচ্ছুক।" এইভাবে কৃষকদের সাথে সংলগ্ন এলাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের সংঘাত সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে লাগল সি পি এম নেতৃত্ব।

ইতিমধ্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ চেক বিতরণ শুরু হলে, ব্যাপক হারে কৃষিজীবি মানুষ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যক মানুষ চেক নিয়েছে বলে মিথ্যা প্রচার করা হতে থাকে। এই চেক বিলি ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট অস্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যায়। সি পি এমের ছত্রছায়ায় থাকা অনেকেই যাদের ঐ অঞ্চলে এক ইঞ্চিও জমি ছিল না, তারা উপযুক্ত কাগজপত্র ছাড়াই পার্টির প্রভাব খাটিয়ে ও সরকারি কর্মচারীদের একাংশের মদতে চেক পেয়ে রাতারাতি লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে যায়। এমনভাবে অনেক ভুয়া মালিক ও সম্পন্ন বর্গাদার লাভবান হয়ে যায়।

২০০০ সালে রাজারহাটের কৃষকদের জমি রক্ষা কমিটির তরফ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে একটি মামলা হয় এবং কৃষকদের একটি সংগঠন যাবতীয় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়। সি পি এমের গুণ্ডাবাহিনী, যারা পূর্বে কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোর করে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ ধরিয়েছিল, এই মামলা চলাকালীন ভয় দেখিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে সেই সব নোটিশ কেড়ে নেয়।

থাকদাঁড়ী, মহিষগোঠ ও মহিষবাথান এলাকায় সি পি এমের যতটুকু অস্তিত্ব ছিল, সেই সমস্ত এলাকার পার্টি শাখার পার্টি সদস্য ও সমর্থক, যারা কৃষকদের সমস্ত লড়াই আন্দোলনে পাশে থাকতেন, তাদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ বাধ্য করেছিল এলাকা ছাড়তে। বিরোধীহীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে, সন্ত্রাস কবলিত এলাকার মানুষকে আরও ভীত সন্ত্রস্ত করে সি পি এম মানুষের বলা বা শোনার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল। জমি অধিগ্রহণ সহ কোনো বিষয়ে সি পি এমের স্থানীয় কোনো নেতা বা সদস্যর সাথে যোগাযোগ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আদেশ অমান্যকারী ব্যক্তির পরিণতি হত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এমনকি এই বিষয়ে সি পি এমের নেতা বা সদস্যরাও ছাড় পেতেন না।

জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার সূচনা হয় থাকদাঁড়ী ও মহিষগোঠ থেকে। এমনই এক অসহায় পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং সি পি এম ও তার মদতপুষ্ট বাহিনীর হাতে সর্বস্বান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে কাঠা প্রতি ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকায় কিছু কৃষক অধিগ্রহণের পক্ষে সায় দেওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ কৃষিজীবি মানুষ তাদের জন্ম জন্মান্তরের অধিকার ও জীবিকা হারানোর ভয়ে এই প্রক্রিয়ার বিপক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন। যার পরিণতিতে এই অঞ্চলের কৃষকদের ওপর চালিয়ে দেওয়া হয় সন্ত্রাসের রোলার।

ইতিমধ্যে থাকদাঁড়ী ও মহিষগোঠের নিকটবর্তি মৌজা চণ্ডিবেড়িয়ায় সি পি এমের মদতপুষ্ট শিবকালী মন্দির অঞ্চলের সমাজবিরোধীরা ঐ এলাকার মানুষকে সন্ত্রস্ত করে জমি দখল করতে শুরু করে। এক এক করে সমস্ত জমি দখল করে বিক্রি করতে শুরু করে। এলাকার অনেক রায়তদার ও রেকর্ডভূক্ত বর্গাদারের জমি তারা দখল করে নেয়। যখন মহিষবাথান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত (যা বর্তমানে রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার অংশ বিশেষ)-এর প্রাক্তন উপপ্রধান এবং সি পি এমের ১ নং রাজারহাট আঞ্চলিক কমিটির সদস্য বিবেক নস্কর ও ঐ আঞ্চলিক কমিটির অন্তর্গত চণ্ডিবেড়িয়া শাখার শাখা সম্পাদক শ্রীকান্ত মণ্ডলের পৈত্রিক ওয়ারেশান সূত্রে প্রাপ্ত চাষের জমি এইভাবে মস্তানদের দখলে চলে যায়, আতঙ্কিত গ্রামের মানুষ বাধ্য হয়ে তাদের জমি অধিগ্রহণে মত দেয়।

ঐ সমস্ত অঞ্চলে সন্ত্রাসের নজির সৃষ্টি করে মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা ২৫০-৩০০ সি পি এমের লাল সন্ত্রাস বাহিনী (যাদের উপনগরির উপকণ্ঠে অবস্থিত থাকদাঁড়ীর এ্যাকোয়াটিকা বা জলকেলিতে যৌন বিনোদন করতে আসা শহর বা শহরতলির একশ্রেণীর পয়সাওয়ালা উশৃঙ্খল যুবক-যুবতীদের নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজনে নিয়োগ করা হয়েছিল) ও পুলিশের বিশাল বাহিনী নিয়ে অন্যান্য মৌজায় অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সরকার ও সি পি এমকে আর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। 'লাল' সন্ত্রাসে সন্ত্রস্ত মানুষ এদের বাধা দেওয়ার মতো কোনো সাহস আর দেখাতে পারেনি। ঘুনি, যাত্রাগাছি ও সলুঙ্গুড়ীতে বিক্ষিপ্তভাবে দানা বাঁধা আন্দোলনকে নির্মমভাবে প্রতিহত করা হয়। আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকা কয়েকজন যুবকের ওপর মস্তান বাহিনী ও পুলিশের যৌথ অত্যাচার স্মরণ করিয়ে দেয় সত্তরের দশকে নকশালপন্থী আন্দোলনকে দমনের জন্য পুলিশী নৃশংসতাকে। হাত-পা বেঁধে পিটিয়ে, জ্বলন্ত সিগারেট-বিড়ির ছেঁকা সহ পশ্চাদদেশে পুলিশের রুলের লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় জনসমক্ষে ছেড়ে দিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করা হয়। কারণ এরা এই নীতিতে বিশ্বাসী যে, অত্যাচারের ভয়াবহতায় সন্ত্রস্ত মানুষ আন্দোলন থেকে শত ক্রোশ দুরে থাকবে।

হাতিয়াড়া মৌজার মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সি পি এম। গ্রামের মানুষের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে যৎসামান্য জমিকে অধিগ্রহণের বাইরে রেখে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, নির্ধারিত সীমানার বাইরের জমি একমাত্র অধিগ্রহণ করতে দেওয়া হবে। কিন্তু কিছুদিন পর জেলা ও জোনাল কমিটির তরফ থেকে জানানো হয় যে, এই বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই। অতঃপর ফরমান জারি করা হয় যে, পার্টির কেউ যেন এই বিষয়ে কোনো আগ্রহ না দেখায়। পার্টির ফরমান উপেক্ষাকারি পার্টি কর্মীর ওপর খড়গহস্ত হয়েছে পার্টি নেতৃত্ব। নিদর্শন হিসাবে, পার্টির মহিষগোট শাখার সদস্য রাখাল মণ্ডলের দাদা জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করার অপরাধে, রাখাল মণ্ডলের পার্টি সদস্যপদ কেড়ে নেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে কৃষক ও স্থানীয় মানুষের যাবতীয় আন্দোলন ও প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া গতি লাভ করে। এক এক করে সমস্ত মৌজার জমি দখল করে নেওয়া হয়। এই কাজে প্রশাসনিকভাবে পুলিশ ছাড়াও সি পি এমের গুণ্ডাবাহিনীকে কাজে লাগানো হয়। কৃষক ও স্থানীয় মানুষ বেশ কিছু জায়গায় বাধা দিলে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনীর সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃষক রমনীরা তাদের অতি সাধের জমির ওপর শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ জানান। অবশ্য তাদের এই বেয়াদপী সরকার সহ্য করেনি। পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে। তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে গ্রামে গ্রামে পুলিশ গুণ্ডাবাহিনী পাঠিয়ে গ্রামের কৃষকদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। এই কাজ ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকে, যতদিন পর্যন্ত না কৃষকদের কণ্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং এই সময়েই সরকারি

সন্ত্রাসের সব থেকে জঘন্য নিদর্শন প্রদর্শিত হয়। বহু মানুষকে হত্যা করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে পুলিশের খাতায় আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। বহু মানুষকে মেরে তাদের লাশ উপনগরীর কাজে আসা লরি ও ট্রাকে করে অন্যত্র চালান করে দেওয়া হয়। আবার অনেককে হত্যা করে মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হয়। পুলিশের খাতায় এদের নিখোঁজ বলে দেখানো হয়। খুব কম করেও অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ সরকারী বা সামাজিক ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বলি হয়।

এত নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েও আন্দোলনরত কৃষকদের আন্দোলনে কোনো খামতি ছিল না। তারা সমস্তরকম অত্যাচারকে উপেক্ষা করে তাদের জমি বাঁচানোর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সি পি এমের মস্তানবাহিনী রাজারহাটের অধিগৃহীত নিচু জমিতে মাটি ভরাটের বরাত পেয়ে, মোল্লার ভেড়ি ও সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চ ল যা উদ্বৃত্ত হিসাবে পাট্টা পেয়ে গরিব কৃষকরা চাষাবাদ করে জীবিকা চালাতেন, তার মাটি জোরজবরদস্তি করে কাটতে গেলে, কৃষক নেতা ও সি পি এম থেকে বেরিয়ে আসা কমল পাত্রের নেতৃত্বে কৃষকদের একটি বড় অংশ সংঘবদ্ধ হয়ে বাধা দিল। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় কমল পাত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করে অন্যান্যদের মত গলায় দড়ি দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যার পর থেকে তাঁর পুত্র ও ভাই নিরুদ্দেশ। যাকে অন্যান্যদের মতই আত্মহত্যা বলে পুলিশ চালিয়ে দেয়। এলাকার জনপ্রিয় নেতা কমল পাত্রের এই ভয়ংকর পরিণতিতে রাজারহাটের কৃষক আন্দোলনের মেরুদণ্ড সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ল। তারা আর কখনো এই ভয়ংকর অত্যাচারের বিরোধিতা করার সাহস দেখাতে পারেনি। একে একে এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেল। পরে তাদের মধ্যে কিছু কিছু ফিরে আসলেও, অধিকাংশের এখনো কোনো খোঁজ নেই।

দুঃখের বিষয় এই যে, অসহায় এই মানুষদের পাশে কেউ দাঁড়াল না। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো আগেই তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এমনকি সংবাদ মাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীরা যারা আজ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে এস ই জেড করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ বামফ্রন্ট সরকারের দ্বারা কৃষি জমি কেড়ে নেওয়া ও কৃষককুলের ওপর সংগঠিত অমানুষিক অত্যাচার ও গণহত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার, ঐ সময় তাঁদের একাংশও যদি রাজারহাটের আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে থেকে সামান্য সহানুভূতি দেখাতেন, তাহলে মনে হয় এত কৃষক মারা যেতেন না।

কংগ্রেস তো কোনোদিন কোনো আগ্রহ দেখায়নি, এমনকি তৃণমূল কংগ্রেসও কৃষকদের সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করল তা পুরোপুরি ক্ষমার অযোগ্য। রাজারহাটের কৃষক সংগঠনের তরফ থেকে যখন কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা হয়, তখন তৃণমূলের তৎকালীন নেতৃত্ব দুই সংগঠনের কৃষক নেতৃত্বকে বোঝাল যে, ঐ সংক্রান্ত বিষয়ে যেহেতু তারাও ইতিমধ্যে একটি মামলা করেছে, তাই একই বিষয় বস্তুর ওপর দুটি মামলা একসাথে চললে, দুটিরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাছাড়া একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদের সাংগঠনিক শক্তিও অনেক বেশি, যা কৃষকদের নেই। তাছাড়া আর্থিক দিক থেকেও কৃষকরা এতটাই দুর্বল যে, তারা মামলা বেশিদিন চালাতে পারবে না। এই যুক্তিকে খাড়া করে কৃষকদের মামলা তুলে নিতে অনুরোধ করলে, কৃষকরা তাদের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে মামলা তুলে নিল। কৃষকরা তাদের মামলা তুলে নেওয়ার কিছুদিন পর তৃণমূল কংগ্রেসও তাদের মামলা তুলে নিল। এটা তারা সুপরিকল্পিতভাবেই করেছিল। প্রকৃত পক্ষে সি পি এম এবং সরকারকে সাহায্য করাই এদের মুল লক্ষ্য ছিল। পুরষ্কার হিসাবে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস এতদঞ্চলে সি পি এমের বিশ্বস্ততা লাভ করে বিশ্বস্ত বন্ধু ও সমস্ত জনবিরোধী কাজের শরিকে পরিণত হয়। এদের নেতা ও কর্মীরা সি পি এমের লোকজনের সাথে ট্রেড পার্টনার নিযুক্ত হয়ে রাজারহাট উপনগরী সহ পার্শ্ববর্তী রাজারহাট গোপালপুরে ইমারতি এবং সরবরাহ, নির্মাণ কাজের ঠিকাদারী, পৌর এলাকায় বহুতলের প্রোমোটিং, জমির প্লট কেনাবেচার দালালী ইত্যাদি কাজ নির্বিঘ্নে করে চলেছে। একত্রে ভূমি ও পৌর আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ভূমি দপ্তরের রেকর্ডকৃত পুকুর, ডোবা, অন্যান্য জলাশয় ও জলাভূমি দখল করে মাটি দিয়ে বুজিয়ে তার ওপর বহুতল নির্মাণ করছে। সি পি এমের স্থানীয় অনেক নেতা কংগ্রেস ও তৃণমূল কর্মী ও নেতাদের ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুঁজি খাটাচ্ছে। সি পি এম এলাকায় পৌর আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ইমারত নির্মাণের সময় যাবতীয় ছাড়ের কোটি কোটি টাকা পকেটস্থ করছে ও বেআইনিভাবে রাস্তা নির্মাণের নাম করে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে হিসাব বহির্ভূতভাবে টাকা পয়সা সংগ্রহ করছে। পঞ্চ ায়েত আমলে লাগানো লক্ষ লক্ষ টাকার অতি মূল্যবান গাছপালা কেটে ও অন্যান্যভাবে মানুষের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার অধিকারকে কেড়ে নিয়ে সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থাকে বিপদগ্রস্ত করে তুলেছে, বিরোধী সমস্ত বুর্জোয়া দলগুলো তাদের দোসরের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ এক অদ্ভুত মিলন ক্ষেত্র যেখানে দলমত নির্বিশেষে সব ধান্দাবাজরা স্বাগত।

উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, রাজারহাটের সমস্ত ফলন-যোগ্য জমি, খাল-বিল, পুকুর ও অন্যান্য জলা ভূমি সহ যাবতীয় জমি যখন এক এক করে অধিগ্রহণ হয়ে যাচ্ছে, তখন কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী শহরতলির জল নিকাশি ব্যবস্থা সহ প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার বিপদে আতঙ্কিত ও চিন্তিত রাজ্যের পরিবেশবিদরা হাইকোর্টের গ্রিন বেঞ্চে একটি মামলা দায়ের করেন। ১৬ জুন ১৯৯৯ তারিখে জলাভূমি বাঁচাও দিবস পালনের লক্ষ্যে পরিবেশবিদ সহ রাজারহাটের কৃষক সংগঠনের সদস্যরা কেষ্টপুরের মাষ্টারদা স্মৃতি সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সারাদিন ধরে রাজারহাটের অধিগৃহীত বেশ কিছু জায়গায় মিছিল করে গিয়ে পথসভা করেন ও রাজারহাটের জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। এমনই একটি সভায় কৃষকদের তরফ থেকে স্থানীয় কৃষক নেতা গৌর মণ্ডল সরকার ও স্থানীয় সি পি এম নেতৃত্বের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। যা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়, গৌর মণ্ডলের অনুপস্থিতিতে তার মহিষগোঠ বাড়িতে সি পি এমের গুণ্ডাবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যথেচ্ছ পরিমাণে বোমা ও গুলি বর্ষণ করে চলে যায়। যাতে আতঙ্কিত হয়ে তার বৃদ্ধ পিতা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এইভাবে সাময়িকভাবে হলেও একটি মাত্র সংগঠনই রাজারহাটের কৃষকদের বেদনাকে অনুভব করে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে পরিবেশবিদদের এই আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়।

এতদঞ্চলে সি পি এমের কার্যত কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল না। কংগ্রেস, তৃণমূল ও বিজেপির নেতা ও কর্মীরা নির্বাচনের সময় লোক দেখানো রাজনৈতিক বিরোধিতা করলেও কখনোই তারা স্থানীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে সি পি এমকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়নি। বরং বারে বারে তাদের জেতার পথকে প্রশস্ত করে চলেছে। এ যেন সি পি এমের সাথে তাদের এক অলিখিত চুক্তি হয়ে রয়েছে।

উন্নয়নের রাজনীতি-রাজনীতির অপরাধীকরণ

রাজারহাটের অধিগৃহীত জমির উপর উপনগরী গড়ে তোলার কাজ জোর কদমে শুরু হল। দেশী বিদেশী নানা নির্মাণ সংস্থা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নগরায়ণের কাজ করে চলেছে। মসৃণ ঝাঁ চকচকে বহু লেন বিশিষ্ট রাস্তা, গগনচুম্বি অট্টালিকার সারি, অত্যাধুনিক হোটেল, রিসর্ট, বার-কাম রেস্তোরাঁ, মার্কেট কমপ্লেক্স, শপিং মল, পার্কিং প্লাজা, হাসপাতাল, ধনী ও উচ্চবিত্তদের নানা বিনোদনের কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য এই সমস্ত কিছু গড়ে উঠেছে মাটির নিচে শায়িত গরিব কৃষকদের মৃতদেহ এবং রক্ত ও অশ্রুসিক্ত মাটির ওপর। এই সমস্ত নির্মাণ সংস্থাগুলো যাবতীয় নির্মাণ সামগ্রী নিতে সি পি এম আশ্রিত মাফিয়া ডনদের কাছে দায়বদ্ধ । সংলগ্ন এলাকার যুবকরা সি পি এম ও বিরোধী নেতাদের সুপারিশে ইট, বালি, পাথর সহ যাবতীয় ইমারতি দ্রব্য নির্মাণকারী সংস্থাগুলোর কাছে সরবরাহ করে চলেছে। এছাড়াও বর্তমানে যারা উপনগরীতে জমির প্লট, ফ্ল্যাট, দোকান ইত্যাদি কিনছেন, তারাও সি পি এমের প্রভাবশালী নেতাদের সুপারিশ মতো জমির প্লট-ফ্ল্যাট, দোকান ইত্যাদি কিনতে বাধ্য। যার ফলে ঐ সমস্ত নেতা ও মস্তানরা আজ বহু কোটি টাকার মালিক হয়ে বসেছে। আজ তাদের বিশাল পরিমাণ সম্পত্তি, গাড়ি, বাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ইত্যাদি হয়েছে। ঐ সমস্ত মস্তান ছাড়া উপনগরী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এক ইঞ্চি সম্পত্তি কেনার কারও ক্ষমতা নেই।

উপনগরীর আশেপাশে গজিয়ে উঠেছে বিলাসবহুল রিসর্ট, যেখানে প্রশাসন এবং সি পি এম পার্টির প্রত্যক্ষ মদতে চলছে রমরমা দেহ-ব্যবসা। এরকম কয়েকটির মধ্যে আছে রাজারহাট উপনগরী সংলগ্ন নয়াপট্টিতে বিখ্যাত দৌড়বিদ এবং সি পি এমের বর্তমান সাংসদ জ্যোতির্ময়ী সিকদারের স্বামী অবতার সিং-এর রিসর্ট এবং শেখরপুর ও চাঁদপুর সংলগ্ন অঞ্চলে সি পি এমের ঘরের মানুষ কমল গান্ধীর কয়েক একর জমি নিয়ে গড়ে ওঠা বেদিক ভিলেজ। ঐ সমস্ত রিসর্টের মালিকরা দেশী বিদেশী কলগার্লের আমদানি করে একশ্রেণীর বিনোদন-প্রিয় পয়সাওয়ালা ও উশৃঙ্খল মানুষ, নেতা ও বিশিষ্ট জনদের মনোরঞ্জন করে কোটি কোটি টাকা আয় করছে। যার আয়ের একটা অংশ অবশ্যই বিভিন্ন নেতার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। বিভিন্ন অসামাজিক লোকজনের আনাগোনায় ঐ সমস্ত এলাকায় সামাজিক অস্থিরতার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

ঐ সমস্ত ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা মুনাফার লোভে জমি নিতে আগ্রহী ব্যবসাদাররা ছুটে আসছে। যাদের জমির যোগান দিচ্ছেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক ও বর্তমানে সি পি এমের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তন্ময় মণ্ডল। যিনি সি পি এমের নেতাদের সহায়তায় হিডকোর দপ্তর থেকে অধিগৃহীত মৌজা ম্যাপ থেকে ছাড় দেওয়া জমি ও জমির মালিকদের গোপনে সন্ধান দিয়ে, জমির মালিকদের কাঠা প্রতি মূল্য ১,০০,০০০ থেকে ১,৫০,০০০ টাকা দিয়ে সেই সমস্ত জমি কিনে নিয়ে ৫,০০,০০০ থেকে ৬,০০,০০০ টাকায় বিক্রী করছেন। এইভাবে ইতিমধ্যেই তিনি প্রায় একশ কোটি টাকা আয় করে ফেলেছেন। তার সাথে থাকা সি পি এমের স্থানীয় কিছু দালালও দশ, বিশ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স করে ফেলেছে। এই প্রক্রিয়ায় জমি নিতে গিয়ে বল প্রদর্শনের ঘটনায় স্থানীয় মানুষের সাথে ছোটখাট সংঘর্ষের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটে চলেছে।

দুঃখের ও পরিহাসের বিষয় এই যে, যে জমির জন্য কাঠাপ্রতি কৃষকদের ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকা দেওয়া হয় সেই জমি সরকার ব্যবসায়ীদের কাছে প্রায় ৬,০০,০০০ টাকায় বিক্রি করে। আবার সেই জমির ওপর বহুতল নির্মাণ করে কাঠা প্রতি আনুমানিক ১,৫০,০০,০০০ থেকে ২,০০,০০,০০০ টাকা মুনাফা করছে প্রমোটার-ডেভেলপাররা। অর্থাৎ সরকার যে দামে কৃষকদের থেকে নেওয়া জমি বিক্রি করছে তাতে কৃষকরা পাচ্ছে মাত্র ১ শতাংশ বা কম, আর রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায়ীদের মুনাফার তুলনায় .০০০১ শতাংশের কম। উল্লেখিত সমগ্র রাজারহাটে পৌরসভাভুক্ত জমির মূল্য নির্ধারিত হয় বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটের বর্গফুট হিসাব মূল্যের ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ হিসাবে।

এতসবের পরেও জমি হাঙরদের লোলুপ দৃষ্টি আবার পড়েছে রাজারহাটের অবশিষ্ট কৃষি জমির ওপর। রাজারহাট ও ভাঙ্গড়ের ২৩টি মৌজা নিয়ে অপর একটি উপনগরী গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের নামকরণ করা হয়েছে ব্রাডা, যার পুরো নাম ভাঙ্গড়-রাজারহাট এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। এর মধ্যে রাজারহাট থেকে নেওয়া হয়েছে ১৫টি মৌজা এবং ভাঙ্গড় থেকে নেওয়া হয়েছে ৮টি মৌজা। রাজারহাটের মৌজাগুলো হল — (১) ভাতিন্দা, জমি ১১২.৫ হেক্টর;(২) বাসিনা, জমি ১৩২.০৫ হেক্টর;(৩) খামার, জমি ৬৩.৭৬ হেক্টর; (৪) ছোট চাঁদপুর, জমি ৯৪.৫ হেক্টর; (৫) জামালপুর, জমি ১৮১.৬৩ হেক্টর; (৬) উমরাহাটি, জমি ৮৫.৮ হেক্টর; (৭)শিখরপুর, জমি ২৩১.৫৩ হেক্টর; (৮) কলাবেড়িয়া, জমি ৬৩.১ হেক্টর; (৯) বিষ্ণুপুর, জমি ৩৮৪.১১ হেক্টর; (১০) কালিকাপুর, জমি ১৪১.৪৫ হেক্টর, (১১) কাশিনাথপুর, জমি ১৬১.৩১ হেক্টর; (১২) গঙ্গাবেড়িয়া, জমি ১৬৮.৪৫ হেক্টর; (১৩) নয়াবাদ, জমি ১৭৩.৭৫ হেক্টর; (১৪) হুদারাইত, জমি ২১৯.৪১ হেক্টর; (১৫) জামাগাছি, জমি ৫৭.৬৫ হেক্টর। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙ্গড় অন্তর্গত মৌজাগুলি হল — (১) তারাছাদিয়া, জমি ৭৫.৩২ হেক্টর; (২) দক্ষিণ খয়েরপুর, জমি ৫২.৩৫ হেক্টর; (৩) আবু, জমি ৬২.০৭ হেক্টর; (৪) পিঠ পুকুরিয়া, জমি ৪৯১.৩৪ হেক্টর; (৫) জিরনগাছি, জমি ১৭১.৫৩ হেক্টর, (৬) বামুনিয়া, জমি ৮০২.৩ হেক্টর; (৭) চালতাবেড়িয়া, জমি ১৬০.৫৬ হেক্টর; (৮) চকমারিচা, জমি ১২৫.৩৫ হেক্টর।

২৩টি অধিগৃহীত মৌজার মোট অধিগৃহীত জমির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৩৩,০০০ বিঘা। ব্রাডা প্রকল্পটি হওয়ার কথা রাজারহাট নিউ টাউনের পূর্বদিকে। এই প্রকল্পে যা যা থাকবে তা হল — আধুনিক রাস্তা, নিকাশি, কার পার্কিং, প্লাজা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, খেলার মাঠ, বর্জ্য নিষ্কাষণ ব্যবস্থা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী ব্যবস্থা, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক, আবাসন, শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র, হাসপাতাল, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ওয়াটার স্পোর্টস, এগ্রি-মার্কেটিং জোন, মডেল স্কুল প্রভৃতি।

বলা হচ্ছে যে নিউ টাউনের লাগোয়া এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে যাতে বেসরকারি সংস্থা থাবা না বসাতে পারে, উন্নয়নের অভিমুখ যাতে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের কাছে সমানে পৌঁছায় সে জন্য ব্রাডা এবং বলা হচ্ছে যে সরকারী অর্থ খরচ না করে বেসরকারী সংস্থার সাহায্য নিয়েই নাকি এই সার্বিক উন্নয়ন হবে।

যে পরিকল্পনায় ব্রাডা প্রকল্পটি হতে চলেছে তা অবশ্যই উচ্চবিত্ত মানুষের স্বার্থে বিশেষ এক ব্যবস্থা। যেখানে নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মানুষের কোনো স্থান নেই। বেসরকারী সংস্থার সাহায্য নিয়ে

যেহেতু সমগ্র প্রকল্পটি গড়ে উঠবে, সেহেতু আবার হাজার হাজার কোটি টাকা এর সাথে যুক্ত মন্ত্রী, আমলা ও নেতাদের আয়ের ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করবে। মনে রাখতে হবে যে এই প্রকল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিরাই রাজারহাট উপনগরীতে অধিকৃত জমির মালিক গরিব কৃষকদের জমি ও জীবিকা কেড়ে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। গরিব কৃষকদের রক্তে ভিজে আছে সমগ্র রাজারহাটের মাটি। সে রক্ত আজও শুকায়নি ও কখনোই শুকাবে না।

ব্রাডার কর্তাব্যক্তি বা চেয়ারম্যান রাজারহাটের সি পি এম বিধায়ক রবিন মণ্ডল। ব্রাডার লাগোয়া উপনগরীর অন্তর্ভুক্ত কৃষি জমির ক্ষতিপূরণের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কাঠা প্রতি ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা। কত জমি কোন শিল্পপতিকে দেওয়া হবে তার একটি তালিকা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। রবিন মণ্ডল ও তার দালালদের মাধ্যমে জমির মালিকদের কাছে সরকার নির্ধারিত মূল্যের তুলনায় দ্বিগুণ বা তিন গুণ টাকা অর্থাৎ কাঠা প্রতি ২০,০০০ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা আদায় নিয়ে তাদের পক্ষে আমমোক্তার নামা বা পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি লিখিয়ে নেওয়া হয়। রবিন মণ্ডলদের কাছে শিল্পপতিদের নামের তালিকা রয়েছে। যাদের কাছে ঐ সমস্ত জমি কাঠা পিছু ২,০০,০০০ থেকে ৬,০০,০০০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। এইভাবে পুনরায় হাজার হাজার কোটি টাকা ফাটকা দালালি বাবদ পকেটস্থ করার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে ফেলেছেন ঐ সমস্ত ধান্ধাবাজ নেতারা।

তবু বাঁচার লড়াই চলবে

আবারও কত রক্ত ঝরবে, কত মায়ের কোল খালি হবে, কত স্ত্রী তার স্বামীকে হারাবে, কত শিশু অনাথ হবে, কত মানুষ জীবিকা হারিয়ে পথের ভিখারী হবে জানা নেই। শ্রমজীবী মানুষকে এর হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। একমাত্র শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই তাদের মুক্তির পথকে প্রশস্ত করতে পারে।

যে সমস্ত কৃষিজীবী মানুষ রাজারহাটে জমি অধিগ্রহণের সময় সি পি এম এবং সরকারি সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন, তাদের নামের তালিকা নিচে দেওয়া হল। যদিও এই তালিকা অসম্পূর্ণ, কারণ অধিকাংশ মানুষ এখনো নিখোঁজ। তাদের আত্মীয় পরিজনরা এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন, আর কখনো ফিরে আসবেন কিনা জানা নাই। অনেককে যাদের হত্যা করে মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হয়, তাদেরও কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি পুলিশী অসহযোগিতার কারণে। তবুও আমরা নিশ্চিত যে ৫০-এরও অধিক মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

আমাদের জানা নামগুলো — ১। সাধু সর্দার, ২। অরবিন্দ মণ্ডল, ৩। পবন মণ্ডল, ৪। প্রবোধ সর্দার, ৫। কুবীর মণ্ডল, ৬। গণেশ মণ্ডল, ৭। অরুণ মণ্ডল, ৮। কমল পাত্র, ৯। কাবু মণ্ডল, ১০। স্বপন মণ্ডল, ১১। তনু নেয়, ১২। শ্যামল নষ্কর, ১৩। বাসুদেব নষ্কর—এরা সকলেই মহিষগোঠ, থাকদাঁড়ী বা আশপাশ অঞ্চ লের বাসিন্দা।

রাজারহাট একদিন রাজ্যের কৃষি মানচিত্র থেকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাবে। স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে হয়ত অসহায় কৃষকদের লড়াই। কিন্তু তাদের লড়াই ব্যর্থ হবে না। তাদের রক্তসিক্ত মৃত্তিকা ভিত গড়ে তুলবে নতুনভাবে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের। সংহত করবে শ্রমজীবী মানুষের শক্তিকে। নতুন উৎসাহে সমস্ত শোষণ নিপীড়নের ওপর প্রত্যাঘাত হানার উৎসাহ সঞ্চার করবে তাদের মধ্যে। মরীচিকার পিছনে না ছুটে শ্রমজীবী মানুষ সংঘবদ্ধ হবে প্রকৃত বিপ্লবী দলের পতাকাতলে।

কোন ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক হয়ত কখনো রাজারহাটের অসহায় কৃষিজীবী মানুষদের নিয়ে লিখবেন। তাদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন কৃষকদের লড়াই ও আত্মবলিদানের প্রকৃত তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরেন এবং উন্মোচন করেন কায়েমী স্বার্থের মুখ ও মুখোশ।

হে রাজারহাটের বীর শহীদরা, তোমাদের রক্তকে আমরা ব্যর্থ হতে দেব না।

সংযোজন

উপনগরীর আড়ালে যৌন পর্যটন শিল্প

বেদিক ভিলেজ

কলকাতার উপকণ্ঠে মূল শহর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দুরত্বে রাজারহাটের ঝাঁ-চকচকে উপনগরীর লাগোয়া গ্রামের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ এক শ্রেণীর শিল্পপতিদের কাছে যৌন পর্যটন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল। একে একে তারা জমির প্রয়োজনে ভিড় করতে শুরু করল। খোঁজ শুরু হল উপযুক্ত জমির। জমি যোগাড়ে তৎপর হয়ে উঠল এলাকার সি পি এমের সমস্ত ছোট-বড় নেতা এবং তাদের একাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেসের নেতা কর্মী ও মস্তান বাহিনী। তাদের এই কাজকে প্রথমদিকে এগিয়ে যেতে অনেকটা সাহায্য করেছিল কুখ্যাত জমি মাফিয়া কমল গান্ধী। যিনি রাজারহাটের ত্রাস সি পি এম ঘনিষ্ঠ গৌর বাহিনীর সাহায্যে আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে গরিব কৃষকদের কাছ থেকে বেশ কিছু জমি ছিনিয়ে তার ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেন। যার সূত্র ধরে রাজকিশোর মোদী, পীযুষ ভগত ও অরুণ মাহেশ্বরীদের রাজারহাটে আনাগোনা শুরু। ১৯৯৭-২০০২-এর মধ্যে বেশ কিছু জমি নামে-বেনামে এই সমস্ত শিল্পপতিরা হাতিয়ে নেয়, যাতে ভূমি অধিগ্রহণ ও সংস্কার সংক্রান্ত সমস্ত আইনকে নির্বিচারে লঙঘন করা হয়। আস্তে আস্তে এক একটি অঞ্চলে যৌন বিনোদন কেন্দ্র খোলা হয়! যার কোনটির নাম বেদিক ভিলেজ, তো কোনটির নাম অলিভ গার্ডেন, বেঙ্গল কে ডি ইত্যাদি। পাঁচতারা কায়দায় যাবতীয় কন্টিনেন্টাল খানাপিনার ব্যবস্থার পাশাপাশি সন্ধ্যা ও রাতকে আরও রঙিন ও মোহময়ী করে তুলতে বার, কলগার্লের ব্যবস্থা চলতে থাকে। যৌন পর্যটকদের আরও বেশী করে আকৃষ্ট করতে আরও বেশী করে জমির প্রয়োজনে জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল। বন্দুকের নলের ডগায় কৃষকরা তাদের শয়ে শয়ে একর জমি হারালেন ও জীবিকাচ্যুত হয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তারা পঞ্চায়েতে গেলেন, অভিযোগ জানালেন থানা ও ভূমিরাজস্ব দপ্তর সহ প্রশাসনিক সমস্ত স্তরে, এমনকি বিরোধী তৃণমূল ও কংগ্রেসের নেতা মাতববরদের কাছে। কিন্তু হায়! তাদের জানা ছিল না যে, এরা সকলেই বিকিয়ে গেছে। সি পি এম তো আগেই গরিব খেটে খাওয়া মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে পুঁজির দালালে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ কি, যারা মা-মাটি-মানুষের জন্য আন্দোলনের কথা বলে শুধু এই রাজ্য নয় দেশের রাজনীতিকে উত্তাল করে তুলেছে, তাদের দলেরও তো নেতা, নেতৃত্বরা শাসক দলের লোকজনের সাথে মিলিত হয়ে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

রাজারহাটে কৃষকদের সর্বনাশ করে রাজারহাটের উপকণ্ঠে ব্রাডাতে কৃষিজীবি মানুষদের সর্বস্বান্ত করার খেলা যে কিভাবে সংগঠিত হচ্ছে, তা হয়তো আগের মতই অজানা থেকে যেত,

যদি না একটি ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল, মস্তানদের গুলিতে এক নিরীহ তরুণের হত্যা ও তার রোশে বেদিক ভিলেজে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটত। সরকারি ও প্রশাসনিক স্তরে চাপান উতর, প্রচার মাধ্যম ও সংগ্রামী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রমাগত চাপের ফলে শেখরপুরে অবস্থিত বেদিক ভিলেজকে ঘিরে বেদিক কর্তা, স্থানীয় পঞ্চায়েত, পুলিশ প্রশাসন, রাজ্য সরকার, শাসক ও বিরোধী দলের অনেক কুকীর্তি নজরে আসে। বেদিক ভিলেজের অভ্যন্তর থেকে উদ্ধার হওয়া প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা-বারুদ, পুলিশের হেলমেট, বস্ত্র, বিভিন্ন তথ্যাদি শাসক ও বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের পরস্পরের বিরুদ্ধে দোষারোপ ও শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুড়িতে রাজ্যবাসীর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, রাজারহাট উপনগরী ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর সাধের শিল্পায়নের প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবেই অস্বচ্ছ। বেদিক ভিলেজের কর্তা রাজকিশোর মোদী, প্রজেক্ট ম্যানেজার বিপ্লব বিশ্বাস, ভাঙড়ের তৃণমূল বিধায়ক আরাবুল ইসলামের ভাই শরিফুল ইসলাম (খুদে) ও স্থানীয় মস্তান গফফর মোল্লার গ্রেপ্তার এবং জেরার মুখে তাদের স্বীকারোক্তি যে, গ্রামের কৃষকদের ভয় ভীতি দেখিয়েই জমি কেড়ে নেওয়া হত এবং একাজে তারা রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সমস্ত মহলের কাছ থেকে সমানভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা পেয়েছে। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মত এখানেও একটি জমি লুটেরা চক্র গড়ে উঠেছে।

বেদিক ভিলেজ ও আপাতত প্রচারের আলোর আড়ালে থাকা অলিভ গ্রীণ নামক যৌন পর্যটন কেন্দ্র কিভাবে গড়ে ওঠে এবং কার কার সহযোগিতায়, তা এ লেখনির মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

বেদিক ভিলেজ—সি পি এমের রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্যা সরলা মাহেশ্বরী, তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় জমি-মাফিয়া কমল গান্ধী ও পীযূষ ভগতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লুম্পেন যৌন ব্যবসায়ী রাজকিশোর মোদী ১৯৯৭-২০০২ সালের মধ্যে সঞ্জীবনী প্রজেক্ট নামে একটি ভূয়ো কোম্পানী ও অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠানের নামে ব্রাডা এলাকার চাঁদপুর পঞ্চায়েতের অধীন শেখরপুরে ১০ একর জমি কেনে এবং রাজারহাট ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর তা অতি দ্রুততার সাথে মিউটেশন করে দেয়। কিন্তু ২০০৩ সালে যখন ভূমি দপ্তর তদন্ত করে দেখে যে সঞ্জীবনী প্রজেক্ট ও তার সহযোগিরা নামে-বেনামে ৭৬ একর জমি হস্তগত করেছে, তখন তারা ঐ জমির মধ্যে থেকে ৫২ একর জমি খাস করে দেয় (বর্তমানে জমির ঊর্ধবসীমা আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূদয় বা কোম্পানি ২৪ একরের বেশী জমি রাখতে পারে না)। ঐ বছরের জানুয়ারী মাসে সঞ্জীবনী প্রজেক্ট ৫২ একর জমি খাস করার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করলে, আদালত ঐ বছর মার্চ মাসে উক্ত কোম্পানিকে উক্ত জমির চরিত্র (চাষের জমি ও জলা জমি) বদল না করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ঐ বছরের মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে সরেজমিন তদন্ত করে দেখা যায় যে সঞ্জীবনী কর্তারা আদালতের নির্দেশকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সমগ্র ৭৬ একর জমিরই চরিত্র বদল করে ফেলেছে। ২০০৩-এর ৪ সেপ্টেম্বর রাজ্য ভূমি দপ্তর সঞ্জীবনী প্রজেক্ট ও সহযোগী কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করে। সঞ্জীবনী কর্তারা যার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই উক্ত কোম্পানী উচ্চ আদালতে বিচারপতি জয়ন্ত বিশ্বাসের এজলাসে জমি খাস করার বিরুদ্ধে পুনরায় মামলা করে। উক্ত আদালত তাকে আদালতের বিচার্য বিষয় নয় বলে রায় দিয়ে দরখাস্তকারী কোম্পানীকে ল্যাণ্ড রিফর্ম ও টেনেন্সী ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। ২০০৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ট্রাইব্যুনাল সঞ্জীবনী প্রজেক্টের মামলা খারিজ করে দেয়। এরপর সঞ্জীবনীর সাথে ভূমি দপ্তরের গোপন বোঝাপড়ায় ২০০৪ সালের ৪ মে রাজ্য ভূমি দপ্তরের দ্বারা একটি 'সরকারি নির্দেশ' (গভর্ণমেন্ট অর্ডার বা জি ও) জারি হল। যাতে বলা হয়, 'কেউ যদি ভুল করে খাস জমি ক্রয় করে বা ক্রয়ের পর তা খাস হয়ে যায় তা হলে সরকার ঐ বিপন্ন ব্যক্তি বা সংস্থাকে ঐ জমি ৯৯ বছরের জন্য লিজ দিতে পারে', উক্ত সরকারি নির্দেশ যে ঐ সংস্থাকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই জারি হয়েছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ২০০৬ সালে আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হওয়ার পর সঞ্জীবনী সংস্থাকে ৪৪ একর খাস জমি ৩,৬৭০ টাকা কাঠা দামে মোট ৯৭.৩৬ লক্ষ টাকায় ৯৯ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হয়। পরিহাসের বিষয় যে জমির দাম তৎকালীন জেলা প্রশাসক ৫ কোটি টাকা ধার্য করেছিলেন, সেই জমিকে জলের দরে সঞ্জীবনী প্রজেক্টকে ভেট দেওয়া হল। এমনটি করা হল কার স্বার্থে? এবং তাতে সরকারের কোন উদ্দেশ্য সাধিত হল? যে জমি সরকার ঐ সংস্থাকে ৩,৬৭০ টাকা কাঠা হিসাবে লিজ দেয়, সেই জমি বেদিক ভিলেজ কর্তৃপক্ষ পরে কাঠা প্রতি ৫০,০০০ টাকা দামে বিক্রী করে।

সরকারি খাস জমি বণ্টনের যে নীতি আছে—প্রিন্সিপাল অব ডিস্ট্রিবিউশন অফ ল্যাণ্ড-এর ৪৯ নম্বর ধারায় খাস জমি কেবলমাত্র ভূমিহীন ক্ষেতমজুর বা ১ একরের কম জমি থাকা প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যেই বিলি করতে হবে। আবার কখনও কখনও জনসেবামূলক পরিকল্পনা, যথা সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাইওয়ে, রাস্তা, এমন কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা শিল্প যা অসংখ্য কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরী করে, তাতে ঐ জমি ব্যবহার করা যাবে। অথচ লুম্পেন ব্যবসায়ী রাজকিশোর মোদি সরকারি বদান্যতায় সস্তায় যে জমি পেয়েছে, সেখানে উশৃঙ্খল কিছু ব্যক্তি বিশেষের জন্য যে যৌন বিনোদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, সেখানে তাদের যৌন ক্ষুধা নিবারণের জন্য আশপাশের মহিলারা আসবেন ও পুরুষরা তাদের দালালে পরিণত হবে, সামাজিক দূষণ বাড়বে। খুন জখমের ঘটনা তো আছেই। তাহলে এই ধরনের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই কি ভূমি দপ্তর ও সরকার তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল? তাই সকলের একই প্রশ্ন ঃ উল্লিখিত দুটি বর্গের মধ্যে মোদির বেদিক ভিলেজ কোন বর্গের অন্তর্গত? আদালতের আদেশ লঙঘনকারি ও সরকারের ঘোষিত খাস জমির চরিত্র বদলকারি পুঁজিপতিকে কোন যুক্তিতে সরকার জলের দরে ৯৯ বছরের জন্য জমি লীজ দিল? কৃষি জমির অপ্রতুলতায় প্রায় কোটি খানেক ভূমিহীন কৃষি মজুরের মধ্যে যতটুকু বেনামী বা খাস জমি উদ্ধার হয় তার বিলিবণ্টন না করে যৌন পর্যটন গড়তে সরকার যে কত মরিয়া, তা ঐ পদক্ষেপ থেকেই পরিষ্কার।

যে সরকার যাবতীয় নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে জমি লুঠেরাদের যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা করে কৃষিজীবী অসহায় মানুষগুলোকে নিঃস্ব করে দিয়েছে, তার প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ অফিসারদের মাধ্যমে ঘোষণা করে যে, জমি হস্তান্তরের বিষয়ে অনিয়মের কোন ঘটনা তারা জানেন না।

জমির বেআইনি হস্তান্তরের বহু অভিযোগ জমা পড়েছে স্থানীয় বি এল আর ও, এ ডি এম এল আর এবং রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। এছাড়াও রাজারহাট থানায় জোর করে ভয় দেখিয়ে জমি কেড়ে নেওয়ার একাধিক অভিযোগ জমা পড়লেও, তারা দেখিনি, শুনিনি গোছের বক্তব্য রেখে নিজেদের দায়িত্ব সারলেও স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কি নিদারুণ অত্যাচার নেমে এসেছে তাদের জীবনে। পরিস্থিতি এমনই যে বেদিক কাণ্ডের সাথে জড়িত কুখ্যাত ব্যক্তিরা কারাগারের অন্তরালে থাকলেও এলাকার মানুষ

মুখ খুলতে রাজী নন। কারণ তাদের মদতদাতা শাসক দলের নেতা মন্ত্রী সহ বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা এখনো তাদের রাজ কায়েম রেখেছে।

রাজারহাটের এক জমিহারা কৃষক (বেদিক ভিলেজের অদূরে শেখরপুরের বাসিন্দা) কাশেম-এর কথায় "সেখানে তাদের কয়েক পুরুষের ভিটে। যেখানে বর্তমানে তার ও তার ভাই মনসুরের পরিবার বসবাস করে। শেখরপুরে যেখানে বেদিক ভিলেজ গড়ে উঠেছে সেখানে তাদের পাঁচ বিঘে চাষের জমি ছিল"। তার কথায়, "জমি বেশী না থাকলেও যা ছিল তার ওপর ধান, শাক-সব্জি ফলিয়ে আমাদের দুই ভাইয়ের পরিবারের অনায়াসে পেটের ভাতের জোগাড় হয়ে যেত। নিজেদের পরনের কাপড়-চোপড় ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া সবকিছুর জন্য কোন চিন্তা করতে হত না। বাড়িতে লেখাপড়ার চল খুব একটা ছিল না, তাই আমি ও আমার ভাই বিশেষ লেখাপড়া করিনি। কিন্তু পাশাপাশি হিন্দুদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করতে দেখে, নিজের ছেলেমেয়েদের মাদ্রাসা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাছাকাছি একটা প্রাইমারী ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিই। আমার ভাইও তাই করে। মোটামুটি ভালই চলছিল সবকিছু। কিন্তু এই সুখ কপালে বেশীদিন থাকল না। একদিন শুনতে পেলাম যে, কলকাতার কয়েকজন বাবু আমাদের জমি মাপামাপি করছে। তাদের সাথে গফফর মোল্লা ও কেলেবাবুরা রয়েছে। এই কথা শুনে আমরা এলাকার কয়েকজন চাষি ওখানে ছুটে গেলাম। সেখানে দেখলাম যে রাস্তার ধারে পুলিশের কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। থানার বড়বাবু আমাদের ওখানে যেতে নিষেধ করলেন। উনি বললেন এই জমি সরকার নিয়েছে। তোমাদের কিছু বলার থাকলে সরকারকে বল। কিন্তু, আমরা তখন বললাম যে, সরকার যদি জমি নেয়, তাহলে তো আমাদের আগে নোটিশ দিয়ে জানাবে। তাতে উনি বললেন যে, অত কথার জবাব দিতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, ওখানে আর যাওয়া যাবে না। গেলে কিন্তু সকলকে এ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব। নিজেদের চোখের সামনে নিজেদের হাতে গড়া স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার হতে দেখে আমরা সকলে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ি। এমন সময় আমাদের মধ্যে কয়েকজন ঠিক করে যে, স্থানীয় পঞ্চায়েত নিশ্চয় সবকিছু জানে, তাই পঞ্চায়েত অফিস গিয়ে ব্যাপারটা জানতে চাওয়া হোক। পঞ্চায়েত অফিস গিয়ে কোন কাজ না হওয়ায় আমরা ঠিক করি যে, যাই হোক আমরা জমির ওপর পড়ে থাকব কিন্তু জমি ছাড়ব না। কিন্তু সেদিন রাত থেকেই পরিস্থিতি বদলে যেতে শুরু করল। গফফর মোল্লা ও কেলেবাবুরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে লাগল যে, ওখানে সরকার কিছু করবে না, ওখানে বড় বড় ব্যবসায়ীরা চিকিৎসার জন্য কিসব ঘর বাড়ি বানাবে। সেখানে যাদের জমি যাবে তাদের মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আর জমি না দিলেও তা এমনিই দখল করে নেওয়া হবে। থানা কোর্টে গেলেও কোন লাভ হবে না। তারা এও হুমকি দেয় যে, যারা বেশী বাড়াবাড়ি করবে, তাদের মেরে লাশ গুম করে দেওয়া হবে। আমরা হতাশ না হয়ে অন্যান্য গাঁয়ের লোকজনের সাথে কথা বলে জমিহারা গাঁয়ের লোকজনদের সাথে লড়াইয়ের জন্য জোট বাঁধলাম। ভূমি দপ্তর, থানা, বিভিন্ন দলের লোকজনের সাথে যোগাযোগ শুরু হল। ইতিমধ্যে গফফর বাহিনীর লোকজন চুপ করে বসে রইল না, তারা কিছু লোককে ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন কাগজপত্রে সই করিয়ে নামমাত্র টাকার বিনিময়ে তাদের জমি আত্মসাৎ করল। অনেককে আবার বাড়ি থেকে জোর করে নিয়ে গিয়ে তাদের জমি রেজিস্ট্রি করিয়ে নিল। যারাই প্রতিবাদ করেছে তাদের কপালে জুটেছে চরম দুর্দশা। কাউকে কাউকে হয় বাড়ি-ঘর ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়েছে, না হলে যারা তাদের বাড়ি-ঘর, জমি-জমা আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে, তাদের মধ্যে অনেককে খুন করে তাদের লাশ গুম করে দেওয়া হয়েছে।" এরকম সময় একদিন কাশেমের ভাই মনসুর—সেই এলাকায় যুবকদের মধ্যে ছিল খুবই প্রিয় এবং যে এইভাবে জমি আত্মসাৎ-এর বিরোধী ছিল, একদিন রাতে তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাঠের ধারে খুন করা হয়। কিন্তু তার লাশের কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। যে আজও পর্যন্ত পুলিশের খাতায় নিখোঁজ হয়ে আছে। "এখন সবকিছু হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি, থাকার মধ্যে শুধু মাথার ওপর চাল বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার মত আর কিছু নাই। নিজের ভাইয়ের পরিবারকে চালাতে এই ভ্যান চালানোকেই পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছি। কোন দিন কিছু জোটে তো কোনদিন একেবারেই কিছু জোটে না। বৌটাও সংসার সামলাতে পাশের উপনগরীতে অন্যান্য বাড়ির বৌদের সাথে ঝিয়ের কাজ করতে যেত। কিন্তু আজ কয়েকমাস ধরে সে কাজও বন্ধ। কেন জিজ্ঞাস করাতে সে ডুকরে কেঁদে উঠে জবাব দেয়, ওর যে কি একটা রোগ হয়েছে। কিন্তু টাকা পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছি না। ছেলে ওসমানও তিন দিন জ্বরে ভুগে বিনা চিকিৎসায় মরে গেল। বাবা হয়েও কিছুই করতে পারলাম না। বাড়িতে গয়নাগাটি যা কিছু ছিল সব তো আগেই বিক্রী হয়ে গেছে। তাই অসহায়ভাবে তাকে মরতে হল। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর এবার ওর চিকিৎসার জন্য সামান্য পয়সাটুকুও যোগাড় করতে পারলাম না। কেন প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও তো টাকা ধার নিয়ে চিকিৎসা করানো যেত? এই কথার জবাবে সে বলে যে, তাদেরও তো একই হাল, কে কাকে দেখবে। কতদিন হয়েছে তোমার ছেলে মারা গেছে? এর জবাবে সে হাউ হাউ করে কেঁদে বলে যে, আট মাস হয়েছে। জানেন বাবু, একসময় আমার মনে হয়েছিল যে, আর বেঁচে থেকে কি হবে, কিন্তু নিজের ও ভাইয়ের পরিবারের কথা মনে করে আত্মহত্যাও করতে পারছি না। মাঝে মাঝে এই বেদিক ভিলেজের সামনে দুপুরের দিকে গাছের নিচে বিশ্রাম নেওয়ার সময় চোখ বুঝলেই আমার সবুজ ক্ষেতের ছবি চোখে ভেসে ওঠে। যেখানে দেখি খালি সবুজ আর সবুজ। রাতে বাড়িতে ঘুমানোর সময় ওখানকার হই-হুল্লোড়ের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঐ শব্দ মনে হয় যেন হাতুড়ি দিয়ে বুকের পাঁজর ভাঙ্গছে। এখন মনে হয় আমাকে বাঁচতে হবে শুধুমাত্র আমার পরিবারের জন্য নয়, উপরন্তু সেই সমস্ত মানুষের জন্য যারা বড়লোকদের অত্যাচারে নিজেদের মেরুদণ্ডকেই হারিয়েছে। তাদের মেরুদণ্ড সোজা করে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখার জন্য আমাকে বাঁচতেই হবে।"

অলিভ গার্ডেন

অপর একটি যৌন পর্যটন কেন্দ্র, যা রাজারহাটের ব্রাডা অন্তর্ভুক্ত গ্যাঁড়াগড়ি এলাকায়

অবস্থিত এবং প্রচারের অন্তরালে রয়ে গিয়েছে। ভাবার কোন কারণ নেই যে, এখানে জমি নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। স্থানীয় কৃষকদের মনে জমি নেওয়ার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বিস্তর ক্ষোভ আছে। এখানেও রাজারহাট উপনগরী বা ব্রাডাভুক্ত অন্যান্য অঞ্চলে সরকারি, প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক স্তরে যেভাবে নিয়ম কানুনকে উপক্ষো করে পুলিশ ও মস্তান বাহিনীর সাহায্যে ভীতি প্রদর্শন করে উচ্চবিত্তদের মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে বেদিক ভিলেজ জাতীয় যৌন পর্যটন গড়ার লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, ঠিক একই কায়দায় সি পি এমের প্রাক্তন রাজ্যসভা সদস্যা সরলা মাহেশ্বরীর স্বামী অরুণ মাহেশ্বরীর কোম্পানি ক্যানপি প্রজেক্টের অধিকর্তাকে বেআইনিভাবে সরকারের বদান্যতায় ও ক্ষমতাসীন দল সি পি এম এবং বিরোধী তৃণমূল দলের নেতা, স্থানীয় মস্তান ও পুলিশের সহযোগে বিরাট পরিমাণ জমি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ওপর অলিভ গার্ডেন নামক যৌন পর্যটন কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে। গ্যাঁড়াগড়ি মৌজার ১০০ একর, ঝালিগাছি মৌজার আনুমানিক ৭০০ একর ও কাশীনাথপুর মৌজার প্রায় ৬০ একর অর্থাৎ প্রায় ৮৬০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে এই যৌন পর্যটন কেন্দ্রটি। প্রায় ২০০ বছর ধরে ব্যবহার হওয়া একটি মুসলিম কবরস্থানকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। যার প্রায় ২ বিঘা ৪ শতক জমিও দখল করে নেওয়া হয়। স্থানীয় বি এল অ্যাণ্ড এল আর-র দপ্তরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে, ঐ সমস্ত জমি অলিভ গার্ডেনের মালিকদের নামে রেকর্ড করা হয়েছে, অথচ রাজ্য সরকারকে বছরের পর বছর কর দেওয়া স্বত্ত্বেও স্থানীয় কৃষকদের নাম তাদের প্রাপ্য জমি বরাবর রেকর্ড করা হয়নি।

সরকার ও বিরোধী পক্ষের নেতা-কর্মীদের লালসার বলি হয়ে এতদঞ্চলের অসংখ্য গরিব মানুষ যাদের পেশা একমাত্র কৃষি, তারা তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন বহু সাধের জমি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এলাকার মানুষ এতই সন্ত্রস্ত যে, তাদের দুর্দশার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের নাম মুখে উচ্চারণ করতেও ভয় পায়। এতদসত্ত্বেও কিছু নাম যা উঠে এসেছে তার মধ্যে সি পি এম, তৃণমূলের একাধিক নেতা কর্মীর যোগসাজসের বিষয় একেবারে জলের মূতো স্পষ্ট। সি পি এমের স্থানীয় বিধায়ক ও ব্রাডার চেয়ারম্যান রবীন মণ্ডল, দমদমের প্রাক্তন লোকসভা সদস্য অমিতাভ নন্দী, সি পি এমের প্রাক্তন রাজ্যসভা সদস্যা সরলা মাহেশ্বরী ও তার স্বামী অরুণ মাহেশ্বরী, তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় মণ্ডল, রাজারহাটের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সভাপতি জাহানারা বেগম, সি পি এমের ১০ নং আঞ্চ লিক কমিটির সদস্য বক্সো মোল্লা, তার পুত্র আলাউদ্দিন, দেবু বিশ্বাস, দিলীপ বিশ্বাস—যারা সকলেই সি পি এমের কর্মী। এছাড়াও তৃণমূলের প্রদীপ মণ্ডল, সুদীপ মণ্ডল, জাকির আলি মোল্লা ও চন্দন মুখার্জী। উপরিউক্ত সকলেই স্থানীয় গ্যাঁড়াগড়ি, কাশীনাথপুর ও বনমালীপুরের বাসিন্দা। শুধু এরাই নয়, এদের সাথে স্থানীয় মস্তান বাহিনী ও পুলিশ প্রশাসনও যুক্ত রয়েছে। বলাইবাহুল্য এঁরা প্রত্যেকেই প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছে। যাদের অতীত ও বর্তমানের জীবন ধারণের মানের মধ্যে যথেষ্টই সামঞ্জস্যহীনতা দেখা যায়। যে সমস্ত মানুষকে বঞ্চিত করে ঐ বিরাট অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে, তার যথাসম্ভব নামের তালিকা প্রস্তুত করা হল—

ক্রমিক নং	নাম	নিবাস	পিতা/স্বামীর নাম
১।	জওহর আলি মোল্লা	গ্যাঁড়াগড়ি	ঁ মোহর আলি
২।	নিরাপদ বিশ্বাস	,,	ঁ নিতাই বিশ্বাস
৩।	জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	,,	,,
৪।	জগন্নাথ বিশ্বাস (প্রয়াত)	,,	ঁ সীতানাথ বিশ্বাস
৫।	চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস	,,	ঁ কৃষ্ণপদ বিশ্বাস
৬।	শংকর নস্কর (প্রয়াত)	,,	সুবল নস্কর
৭।	হাজি মাদার মোল্লা (প্রয়াত)	,,	ঁ ভোলাই মোল্লা
৮।	ফকির আলি মোল্লা	,,	ঁ মাজেৎ আলি মোল্লা
৯।	জগদীশ বিশ্বাস (প্রয়াত)	,,	ঁ ক্ষিরোদ বিশ্বাস
১০।	পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ	কাশীনাথপুর	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
১১।	চৈতন ঘোষ	,,	,,
১২।	কান্ত ঘোষ	,,	কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
১৩।	ঋষিকেশ ঘোষ	,,	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৪।	মনোরঞ্জন ঘোষ	,,	,,
১৫।	তাপস ঘোষ	,,	মনোরঞ্জন ঘোষ
১৬।	মানস ঘোষ	,,	,,
১৭।	প্রাণতোষ ঘোষ	,,	,,
১৮।	মনময় নাথ ঘোষ	,,	কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
১৯।	কালিপদ কবিরাজ	,,	হরিমোহন কবিরাজ
২০।	ধনঞ্জয় ঘোষ	,,	কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
২১।	রাবেয়া খাতুন	ঝালিগাছি	করিম বক্স
২২।	অক্ষয় বিশ্বাস	কাশীনাথপুর	কালিপদ নাগ
২৩।	আবসার আলি	পাথরঘাটা	মহঃ মোকার্রাম
২৪।	ওয়াজেদ আলি	,,	ইমতিয়াজ আলি
২৫।	মহববত আলি	,,	মহঃ মোকার্রাম
২৬।	আম্রী বিবি	,,	স্বামী আলি আহমেদ
২৭।	ময়না বিবি	কাশীনাথপুর	স্বামী কাসিমুদ্দিন
২৮।	হাবিবুর রহমান	পাথরঘাটা	পিতা ইমতাজা আলি
২৯।	কমলা বিবি	,,	স্বামী ইমতাজা আলি

এই তালিকার বাইরেও আরও বহু মানুষ আছেন যারা বেশিরভাগই কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের ভয়ে স্থান ত্যাগ করেছেন।

এখানে একজনের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। জওহর আলি মোল্লা। পেশায় মধ্যচাষী। স্থানীয় গ্যাঁড়াগড়ি অঞ্চলে কয়েক পুরুষের বাস। অলিভ গার্ডেনের জন্য তাকে অনেক জমি হারাতে হয়েছে। যার প্রথম পদক্ষেপে কালিকাপুর মৌজার ২৩২/১ নং খতিয়ান ও ১০০ নং

দাগভুক্ত জমি থেকে ১৪ শতক জমি জনহিতে রাস্তা করার নাম করে সরকারি সংস্থা পি ডব্লিউ ডি দখল করে। যার আসল উদ্দেশ্য ছিল অলিভ গার্ডেনের প্রবেশ দ্বারকে উন্মুক্ত করা। তার কিছুদিন পর সি পি এমের প্রাক্তন সাংসদ অমিতাভ নন্দীর ঘনিষ্ঠ সল্ট লেকের বাসিন্দা কুনাল রায়ের স্ত্রী সুমিত্রা রায় ঐ একই খতিয়ানভুক্ত ১২৩৬ নং দাগের মধ্যে ১৪ শতক জমি বেআইনি দলিলের বলে স্থানীয় সি পি এম পার্টির নেতাদের নজরানা দিয়ে দখল করেন ও অলিভ গার্ডেনের কাছে হস্তান্তর করেন। এক্ষেত্রে তার ওপর পূর্বের সমস্ত আইনি নিষেধাজ্ঞা যা আদালতের দ্বারা ১৪৪ ও ১০৭ ফৌজদারি বিধি মারফৎ বলবৎ করা হয়েছিল, তা লঙ্ঘিত হয়। এমনকি পি ডব্লিউ ডি দ্বারা দখল করা জমির জন্য তাকে এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। একদিকে যখন তিনি ভূমি দপ্তর ও আদালতে দৌড়াদৌড়ি করে আর্থিক ও মানসিক দিক থেকে জেরবার হয়ে পড়েছেন, ঠিক তখনই তার ৩০ বৎসর পূর্বে সাকিম আলি মোল্লা, পিতা সিকান্দার আলি মোল্লা ও ইমদাদ আলি মোল্লা, পিতা এনসান মোল্লা-দের কাছ থেকে গ্যাঁড়াগড়ি মৌজার ৮৫৫, ৮৫৬ ও ৮৬১ নং দাগের কেনা জমির মধ্যে রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূলের সভাপতি জাহানারা বেগমের শ্বশুর ইয়ার আলি মোল্লা বেআইনিভাবে মালিক সেজে উক্ত দাগভুক্ত জমি থেকে ২৯ শতক বাগান জমি অলিভ গার্ডেনকে হস্তান্তর করেন। যিনি ইতিপূর্বে ঐ মৌজারই জওহর মোল্লার কাছে ২০০২ সালে বিক্রি করা ৮৬৭ ও ৮৬৮ দাগের ১৯.৫০ শতক জমি পুনরায় ২৩-০২-২০০৬ তারিখে মালিক সেজে রেজিস্ট্রী অফিসে দলিল নং আই-০২১২৮-২০০৭ বলে হস্তান্তর করেন। স্থানীয় বি এল আর ও দপ্তরে উপরিউক্ত সমস্ত দাগভুক্ত জমির ওপর কেস নং, টি/৭৬৮১/০৮, টি/৭৭৫৮/০৭ ও টি/৭৭৫৭/০৭ বলে মিউটেশন করার আবেদন করলে, জওহর মোল্লাকে জানানো হয় যে উক্ত সমস্ত জমি ইতিমধ্যে অলিভ গার্ডেনের নামে মিউটেশন করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পুরুষানুক্রমে উক্ত সমস্ত জমি ভোগদখল করা সত্ত্বেও বহু অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও, সময়ের অভাব, লোকবলের অভাব বা অন্য সমস্ত অজুহাত দেখিয়ে বছরের পর বছর মিউটেশনের কাজ স্থগিত রাখা ঐ দপ্তরের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যার সুযোগে ঐ দপ্তরের ভিতর ও বাইরে একদল অসাধু দালাল মিউটেশনের নাম করে মোটা টাকা পকেটস্থ করছে। যার সাথে ভূমি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সমস্ত উচ্চ পদস্থ কর্মচারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত আছে। ঠিক এমনইভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল, স্কুল, মসজিদের জমি ও একটি সমাধি স্থল বা গোরস্থানের জন্য দেওয়া জমি যা জওহর মোল্লার পিতৃপুরুষেরা দান করেছিলেন, তাও পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা রেয়াত করেনি। মসজিদটি গ্যাঁড়াগড়ি মৌজার ২৪৮ নং দাগে অবস্থিত। যার মোট জমির পরিমাণ ১০ শতক। উক্ত জমিটি যখন দখল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন জওহর মোল্লা বি এল আর ও অফিসে তার নামে উক্ত জমি রেকর্ডভুক্ত করার জন্য মিউটেশনের জন্য কেস নং টি/৭৬৮১/০৮ বলে দরখাস্ত করলে, কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের আপত্তির কারণে উক্ত দপ্তর মিউটেশন থেকে বিরত থাকে। এখানে জওহর মোল্লার দ্বারা পেশ করা যাবতীয় দলিল দস্তাবেজকে কোনপ্রকার গুরুত্বই দেওয়া হয় না। অপরদিকে কবরস্থানের জন্য সুরক্ষিত জমি যা গ্যাঁড়াগড়ি মৌজার ৩৪, ১১৭, ৩৪, ১৩৮, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭০০/১, ৪৮৫, ৬৪৭, ৬৩১, ৩৬০, ২৪, ২৪৮, ২৫১, ৩০৬, ৩১৪, ৪৮৫, ৬৯৩/১, ৭৭৩, ৪৫৩, ৫৯১ ও ১৬০ নং খতিয়ান ও ২৮৮, ২৮৯, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১ ও ৪৫২ ভুক্ত দাগে মোট ৬৫ শতক বা ২ বিঘা ৪ শতক জমি, যা বিগত দুই শতাব্দী ধরে মুসলমান সম্প্রদায়ের গোরস্থান হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে, তাও একদিন বলপূর্বক দখলের দ্বারা অলিভ গার্ডেন ভুক্ত হয়। গোরস্থানের জমিটি দখল করার সময় স্থানীয় মানুষের জোরালো প্রতিবাদে শঙ্কিত হয়ে স্থানীয় সি পি এম পার্টির নেতা বক্সো মোল্লা স্থানীয় ১০-১৫ জন আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারি মানুষকে আলাদা করে তার বাড়িতে ডেকে আন্দোলন থেকে বিরত থাকতে বলে প্রাণনাশের হুমকি দেন। স্বভাবতই প্রাণের ভয়ে ভীত মানুষ আন্দোলন থেকে সরে আসলে গোরস্থানটি দখল করতে তাদের আর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

উল্লেখ্য যে, যেখানে সরকারি বাম ও ডান—উভয়েই ভোটের রাজনীতিতে, ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সংখ্যালঘু, বিশেষ করে মুসলিমদের ভোটকে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার অবলম্বন মনে করে, তাদের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবরকম সুযোগ সুবিধার জন্য ওকালতির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, সেখানে সেই সম্প্রদায়ের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে উভয় দলের এই ন্যাক্কারজনক ভূমিকা প্রমাণ করে যে; এরা রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে ভণ্ড। যাদের সন্ত্রাস, লুঠপাট, সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচার ছাড়া মানব সমাজে আর কোন ভূমিকা নেই।

সমস্ত জমি-জমা হারিয়ে এককালের সম্পন্ন চাষি জওহর মোল্লার দিন গুজরান করা দায় হয়ে পড়েছে। বয়সের ভারে কায়িক শ্রম দিতে অসমর্থ জওহরের একমাত্র অবলম্বন তার ছেলে সিরাজ পাড়ার গলির ধারে একটি ছোট গুমটি চালায়। মাঝে মাঝে অপরের জমিতে দিন মজুরির কাজ করে। আবার কখনো কখনো ভ্যান চালিয়ে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। অভাব-দারিদ্র তাদের নিত্য সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরকম অবস্থার সাথে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে একদিন সিরাজের স্ত্রী আত্মহত্যার মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজে নেয়।

এরকম অবস্থা শুধু জওহর বা সিরাজেরই নয়—এলাকার অধিকাংশ মানুষ, এমনকি একসময় যারা সম্পন্নও ছিলেন আজ তারাও চরম অভাব-দারিদ্রে দিন কাটাচ্ছেন। তারা আজ সর্বহারা।

উপসংহারের পরিবর্তে ঃ

রাজ্যের শাসন ক্ষমতা থেকে শাসক 'বাম'পন্থীরা আজ বিদায়ের পথে। পরিবর্তনের নাম করে যারা ক্ষমতায় আসতে চাইছে, ওদের রং আলাদা কিন্তু চরিত্রে কোন পরিবর্তন নেই। রাজারহাট-ব্রাডা অঞ্চলে কৃষকদের সর্বস্বান্ত করতে ওরা একে অপরের দোসর। তাই লড়াই ছিল, আছে এবং জারি থাকবে। প্রকৃত পরিবর্তনের দিশায় এ লড়াই আরও জোরদার করতে হবে। সে পথেই এগিয়ে চলুন।

প্রকাশ কারাতকে পার্টি কর্মীর চিঠি

কমরেড প্রকাশ কারাত
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

বিষয় ঃ অনৈতিক ও পার্টি বিরোধী কাজ সম্পর্কে এবং
পার্টি-বিরোধী শক্তির হাত থেকে পার্টিকে রক্ষা করা সম্পর্কে

কমরেড,

আমি ..... পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অধীনে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির মধ্যে অবস্থিত রাজারহাট অঞ্চ লের একজন পার্টি সদস্য। বিগত ১৬ বছর যাবত বহুবার লিখিতভাবে রাজ্য কমিটিকে এবং শতাধিক বার লিখিত ও মৌখিকভাবে জেলা কমিটিকে রাজারহাট লোকাল কমিটির নেতৃত্ব ও বেশ কিছু পার্টি সদস্যের অনৈতিক ও পার্টি বিরোধী কাজ সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ সহ জানিয়েছি। ...

এই লোকাল কমিটির মধ্যে সমস্ত অনৈতিক ও পার্টি বিরোধী কাজ এবং পৌরসভা ও পঞ্চ ায়েতের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে কোটি কোটি টাকা লুঠ করার নেতৃত্ব দেন লোকাল কমিটির কমরেড ..... ও কমরেড .....। ১৯৯০ সাল থেকে পার্টিতে এরা যুক্ত হন এবং বিগত ১৬ বছরে এরা কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। গোটা পার্টির মধ্যে দুর্নীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করে এই দু'জনের নেতৃত্বে এবং সমগ্র লোকাল কমিটির এলাকার মধ্যে কে কোন জায়গা থেকে অবৈধভাবে টাকা-পয়সা লুঠপাট করবে তাও এরাই ঠিক করে দেন। সমগ্র বহুতল বাড়ি ও সাধারণ মানুষ বাড়ি নির্মাণ করলে এদের দু'জনকে নজরানা দিতে হয় এবং এদের নির্দেশিত সাপ্লায়ের কাছ থেকে ইমারতি দ্রব্য নিতে বাধ্য করা হয়। এলাকার সমস্ত কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের নেতৃত্ব দেন কমরেড ..... এবং কমরেড .....। এদের প্রত্যক্ষ মদতে বিগত ১৬ বছরে ৫০ জনের বেশী মানুষ খুন হয়েছেন। যাঁরা খুন হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমাদের পার্টির কর্মী ও সদস্য ছিলেন। পার্টি ও প্রশাসনের প্রভাব কাজে লাগিয়ে এই দু'জন কমপক্ষে ৪০০ কাঠার ওপর পুকুর বুঝিয়ে দিয়ে বহুতল বাড়ি নির্মাণ করেছে এবং তার থেকে কোটি কোটি টাকা পকেটস্থ করেছে। ..... সমগ্র এলাকা জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মত বেআইনি বহুতল বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে এবং উক্ত দু'জন এল সি এমের নেতৃত্বে এলাকায় প্রোমোটারি-রাজ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষের অধিকারের ওপর নামিয়ে আনা হয়েছে জঘন্যতম আক্রমণ ও জঙ্গলের রাজত্ব। এলাকার প্রধান ও একমাত্র বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের বড় অংশকেই উপরিউক্ত কাজে যুক্ত করা হয়েছে, বস্তুত এই এলাকায় তাদের কোন সাংগঠনিক অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। ..... উক্ত সমস্ত বিষয়ের তথ্য প্রমাণ সহকারে জেলা কমিটিকে অসংখ্যবার ও রাজ্য কমিটিকে বহুবার জানিয়েছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন পার্টিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। .....

তারিখ ঃ ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৬

অভিনন্দন সহ
.....
রাজারহাট

** রাজারহাট অঞ্চলে জমি-গ্রাস ও ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্থানীয় পার্টি কর্মীদের অসংখ্য পত্র পার্টির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পৌঁছেছিল। কিন্তু পার্টি কেন্দ্রের মদতেই রাজারহাটে চলেছে উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ যজ্ঞ ও চরম দুর্নীতি। এই চিঠি তারই এক নমুনা। কারণ বশতই আমরা কোন নাম এখানে প্রকাশ করিনি কিন্তু পার্টির সাধারণ সম্পাদককে পাঠানো চিঠিগুলো পুস্তিকা প্রকাশকের দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন স্থানীয় কর্মীবাহিনী।

কুলপি-বারুইপুর উন্নয়নের বিপজ্জনক প্রকল্প

কৃষি-প্রধান অঞ্চলকে সারা বিশ্বে বস্তুত বিপন্ন ভূমি বলে ধরা হয়েছে। সিঙ্গুর অঞ্চ লটি অবশ্যই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই তথ্যকে বিকৃত করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার পরিবেশ ধবংসকারী কর্মসূচীকে তরান্বিত করতে বদ্ধ পরিকর। তারা রাজারহাট থেকে বারুইপুর-কুলপি পর্যন্ত বিস্তৃত জমি কুখ্যাত সালিম গোষ্ঠীকে দান করেছে কুলপি বন্দর ও সংলগ্ন অর্থনৈতিক কর্মব্যস্ত অঞ্চলগুলিকে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে উন্নীত করার লক্ষ্যে। এর ফলে অবশিষ্ট জলাভূমি — কলকাতার ও উপমহাদেশের জলবিভাজিকা ব্যবস্থা ধবংস হবে।

কলকাতার জলাভূমি যা গঙ্গা-হুগলী-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকার ভূ-জল সম্পর্কিত 'ব'-দ্বীপের অংশবিশেষ এবং হিমালয় সহ আন্তর্দেশীয় জলস্তর অপেক্ষা উচ্চ ভূমিরও অংশ রূপে পরিগণ্য। এর অংশীদার দেশগুলো প্রধানত ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান। দুর্ভাগ্যবশত নগরায়ণের বিস্তৃতির ফলে ঐ জলাজমিগুলো তাদের কার্যকারিতা হারাচ্ছে।

এই ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে রাজারহাট-নিউ টাউনের নগরায়ণকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। হাস্যকরভাবে এই অঞ্চ লের জমিকে শুষ্ক জমি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এটা ছিল বিল ও জোলা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ, যা জলাভূমির অন্তর্ভুক্ত, যার আদর্শ অবস্থান ও ভূমিকা ছিল। ডেল্টা অঞ্চলের উত্তর মুখের সন্নিকটে এর অবস্থান ও কলকাতার জল সম্পৃক্ত অঞ্চলকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের নিকটে এর অবস্থানের দরুণ এই অঞ্চলটি উচ্চভূমি থেকে নদী অববাহিকার উপরিস্তরে প্রবাহমান জলরাশির পথে সরাসরি অবস্থিত। এছাড়াও ভারত-বাংলাদেশের অংশীভূত ডেল্টা নিকাশি-প্রণালী থেকে অনেক ছোট ছোট শাখা খালের সৃষ্টি হয়েছে।

বিপুল নগরায়ণের ফলে (রাস্তা ও আবাসন নির্মাণ) এই অঞ্চলটি জল প্রবাহের পথে দেওয়ালের মতো বাধা হয়ে দাঁড়াবে, যা ইতিমধ্যে বন্যা ও অপরিসর নিকাশি ব্যবস্থার দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়া বাংলাদেশ ও কলকাতার অভ্যন্তরের দিকে পথ পরিবর্তন করেছে। সুন্দরবনের বৈচিত্র্যময় পরিবেশ উপমহাদেশের জলস্তর অপেক্ষা উচ্চ ভূমির অধিকাংশের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র অভিমুখ গঠন করে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই জলাভূমির বড় অংশীদার হিসাবে ভারত ভূ-জল সমতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব থেকে পিছু হটতে পারে না। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার ফল হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

(১) বারাসাত থেকে বারুইপুর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রস্তাবিত জাতীয় সড়ক, যা জলাভূমির পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, তা বাংলাদেশের মরশুমী বন্যা ও নিকাশি সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলবে। তার সাথে যুক্ত বিশ্ব উষ্ণায়ণের বিপদের বাস্তব পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে।

(২) ফরাক্কা ব্যারেজের নির্মাণ বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছে— যা সমস্যাটিকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

(৩) এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি থেকে বঞ্চিত হয়ে, ভূমি ক্ষয়—পলিকরণের সমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবে—এমনকি নেপাল ও ভুটানের মতো জলস্তর থেকে উচ্চ স্থানে অবস্থানরত দেশগুলোরও ক্ষতিসাধন করে।

(৪) জলাভূমির একটি অংশকে একটি আন্তর্জাতিক 'রামসার' সম্মেলন স্থল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর আরও অধিগ্রহণ জলাভূমিকে বিপন্ন করবে।

জাতীয় অর্থনীতি অবিচ্ছেদ্যভাবে এই ধরনের জলা ডেল্টা ভূমির সাথে জড়িত। ভারতীয় অংশের ভূ-জল-এর লোনা প্রকৃতি ও ঢেউয়ের বৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যা উপমহাদেশীয় কৃষি-প্রকৃতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটাবে। জল-প্রকৃতির পরিবর্তন, বন্যার দরুণ সৃষ্ট ভূ-ভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাকে জলমগ্ন করে তুলবে। বিশ্ব উষ্ণায়ণের বাস্তবতার সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের জলস্তরের নীচে অবস্থানরত অঞ্চলগুলো ভয়াবহ বিপদের মধ্যে রয়েছে। সমুদ্র অভিমুখে অবস্থানরত একটি দ্বীপ ইতিমধ্যে সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে এই সমস্ত জলা ডেল্টা অঞ্চলগুলো কৃষি-উৎপাদন, খনিজ ও আকরিক খনিজ সমৃদ্ধ উপকূলের দ্বার (যেখানে কলকাতা হল মুখ্য বাণিজ্য কেন্দ্র)। জাতীয় অর্থনীতির ওপর এইরূপ আঘাত অপরিসীম ক্ষতিসাধন করবে।

বিগত পাঁচ যুগ ধরে নগরায়ণ ও অনিয়ন্ত্রিত অপব্যবহারের ফলে জলাভূমি অঞ্চলগুলোর একটি বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রধানত, নগরায়ণের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব মুখী ব্যাপ্তির প্রভাবে।

পুরনো কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং অর্গানাইজেশনের প্রাথমিক পরিকল্পনা হিসাবে জলাভূমিকে স্পর্শ না করে হুগলী থেকে কল্যাণী পর্যন্ত নগরায়ণ বিস্তারের প্রস্তাব ছিল। যার বিরপীত ফলাফলকে তুলে ধরা হল —

জলাভূমির মধ্যে সঞ্চিত বর্ষার জলের নিষ্কাশন রোধ, বন্যা রোধ, জলনিকাশি ও কলকাতার জনবসতির মধ্যে থেকে নর্দমার জলনিষ্কাশনকে সহজ করার ক্ষেত্রে, কলকাতা শহরের বাইরে যে সমস্ত এলাকার মধ্য দিয়ে খালের মাধ্যমে জল নিষ্কাশন হয়, যা প্রকৃতিগতভাবে বাটির মতো। ক্রমাগত পলিকরণের ফলে কলকাতা হয়তো নিজের দ্বারা সৃষ্ট জল নিষ্কাশনের স্থিরতা ও ভয়ঙ্কর সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হবে। জলা-ভূমির অপব্যবহার ও নগরায়ণ স্থানীয় মানুষের জীবিকানির্বাহের অবলম্বন, যথা মৎস শিকার, জলা-জমির ওপর চাষ-আবাদ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। দারুণ জীব-বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে গঠিত সুন্দরবন ডেল্টার অমূল্য সম্পদ ও ছোট ছোট মৎসজীবী ও মধু সংগ্রহকারীদের জীবিকা হারিয়ে যাবে জমির লবণাক্তভাব ও ঢেউয়ের পরিবর্তনের জন্য। জলের প্রবাহ, হুগলী নদীর ঢেউ ও বর্জ্য নিষ্কাশনের মাধ্যমে তার দূষণ রোধ করার ক্ষমতা, জল পরিশোধনের মূল্যের ওপর প্রভাব পড়তে বাধ্য। সুন্দরবনের ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল যা কলকাতার শহরাঞ্চলকে বিষুবীয় ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বন্যার ভয়ঙ্করতার হাত থেকে রক্ষা করে; উপকূলবর্তী অংশের অপেক্ষা যেখানে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে যাবে।

দুঃখজনকভাবে শিল্পপতি ও ধনিক অংশের স্বার্থকে দেখার বাসনায় রাজ্য সরকার গ্রামীণ মানুষের বড় অংশের স্বার্থকে বিসর্জন দিচ্ছে। কলকাতা বলির পাঁঠায় পরিণত হবে।

সৌজন্য ঃ

সুব্রত সিনহা, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া।

'সরকারি ঘোষণা মতো ৫ লক্ষ লোকের বাসস্থানের সংস্থান করতে গিয়ে ৪০টি গ্রামের ১,১৩,০০০-এরও বেশি কৃষি নির্ভর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ৬১৭০ জন প্রান্তিক চাষি, ২১০৫ জন ছোট চাষি, ৪৬০৫ জন ভূমিহীন চাষি এবং ৪০০০ জন মৎসজীবী বংশানুক্রমিক জীবিকাচ্যুত হবেন।' হিসেবটা পুরনো। ভূমিচ্যুত মানুষের সংখ্যা গত চার বছরে অনেকটাই বেড়েছে, এবং সংখ্যাটা রোজই বেড়েই চলেছে।

(গবেষক কেয়া দাশগুপ্ত, এভিকশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ঃ এ নোট, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিচিত্র, শিল্পায়ন ও কৃষকের ভবিষ্যৎ, মৃত্তিকা প্রকাশন, পৃঃ ১৭৮)

জমিহারা মহম্মদ ফকির শেখের কথা

হাটগাছা হরিদাস বিদ্যালয়ের মাঠে সভায়

" ... জ্যোতি বসু বললে, 'ঢালিপাড়ার কিছু লোক স্বেচ্ছায় জমি দিতে রাজি হয়েছে আপনারাও দিন।' ... 'জমি হারালে কাজ দেব। চার চাকার গাড়ি দেব। নিউ টাউনে বাড়ি তৈরির সময় বালি, পাথর, সিমেন্ট ফেলার কাজ দেব।' (পৃঃ ১৮০, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিচিত্র, শিল্পায়ন ও কৃষকের ভবিষ্যৎ, মৃত্তিকা)

'জমি বেচে কিছু লোকের হাতে বেশি টাকা এল, কিছু লোকের হাতে কম টাকা। বেশি টাকা যারা পেল, বাড়িঘর সারিয়ে নতুন ঘর বানিয়েও যে টাকা বাঁচল ব্যাঙ্কে রাখল। সেই টাকায় কি চলে! ব্যাঙ্কে এখন টাকা রাখলে যা সুদ তার তিনগুণ সুদ গুনতে হয় টাকা তুললে। ব্যাঙ্কে টাকা তুলে কদিন খাবে। কিন্তু যারা কম টাকা পেল তাদের কেউ বাড়ি পাকা করল, কেউ দোতলা তুলল। সেই করতে গিয়ে টাকা শেষ। কারও লায়েক ছেলে আবার বাইক কিনে ফেলল। তাতেই টাকা শেষ। সে জমিটাও হাতছাড়া হল, টাকাও শেষ হয়ে গেল। এ বার সে কী করবে? কেউ হল রং মিস্ত্রি, কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ শিখল, আবার কেউ ইট বওয়ার মজুর হয়ে গেল। রাজারহাটের গ্রামগুলোতে চাষির যে কী বেহাল অবস্থা সে বলবার নয়।

(সিঙ্গুরের ভবিষ্যৎ ঃ রাজারহাটের বর্তমান, ঐ, পৃঃ ১৮২-১৮৪, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক মিলন দত্তের প্রতিবেদন)